সচিত্র শিশু-উপন্যাস

তীর দাঁতে উহা

শ্রীপরেশচন্দ্র বসু প্রণীত

রোমাঞ্চ প্রকাশনী
১২, হরীতকী বাগান
কলিকাতা

কলিকাতা,
২০, ঈশ্বর মিল লেন হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

891.443
28
Acc 24286
18/07/2017

মূল্য বারো আনা

ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৪২

মুদ্রাকর
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
১২, হরীতকী বাগান লেন,
কলিকাতা।

লরীটা গণ্ডারের প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে হুড়মুড়

করে উল্টে পড়ল। পৃঃ ৪৫

হঠাৎ দাঁতের [illegible]য়

[illegible] গ্রন্থাগার
ডাক সংখ্যা ৮৯১.৪৪৩
পরিগ্রহণ সংখ্যা ২৪২৮৩
পরিগ্রহণের তারিখ ০৬/০৮/২০০৭

= এক =

সূচনা

পূব আকাশে তখন সবেমাত্র আলোর ছোঁওয়া লেগেছে। গাঢ় অন্ধকারটা ক্রমে তরল হয়ে এসে ভীতু ছেলেটার মত [illegible] সরে পালাচ্ছিল—গাছের পাতার অন্তরালে, দূর পাহাড়ের পায়ের তলে। ঠাণ্ডা হাওয়াটা স্নেহময়ী জননীর কোমল হাতের মতই মুখে চোখে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল।

পুরাণো লরীর বিকল ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করতে করতে রঞ্জিত বললে, ক্লাচটাতে যেন কি হয়েছে, কারবুরেটরটার মুখে [illegible] ধূলো জমেছে, আর···

আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিল না এতে, তাই হেসে উঠে বললুম, আর কি?—ব'লে যা।

আমার হাসি দেখে রঞ্জিত চটে উঠে বললে, তা' [illegible] বৈকি! তোর মত আনাড়ীর হাতে পড়েই না বেচারার আজ

এই অকাল বার্দ্ধক্য। স্ক্রুগুলোও দেখ না বুড়োর দাঁতের মত নড় নড় করছে।

আর চটানো ঠিক হবে না ভেবে আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে গেলুম।

গাড়ীটা আমাদের পুরাণো। আফ্রিকার সুদূরব্যাপী বনের মধ্যে যে কোন সময়ে বিগড়ে গিয়ে হয়ত বিপদে ফেলতে পারে। তবু সারিয়ে নিয়ে কাজ চালানো ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায়ও ছিল না।

কারণ এই লরীর পিঠেই চাষীদের মাল চাপিয়ে দেশ [illegible] ছুটে বেড়িয়ে আমরা জীবিকা অর্জ্জন করতুম।

সে আজ সতেরো আঠারো বছরের কথা। মা মারা গেলে বাবা আমাদের দু'ভাইকে নিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে এই পূর্ব্ব-আফ্রিকায় আসেন।

এইখানেই আমাদের শৈশব ও কৈশোর কেটে গেল। যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবি, আমরা শুধু নামেই বাঙ্গালী রয়ে গেলুম। বাবার মুখে শুনেছি—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' কিন্তু জীবনে কোনদিন যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি, আজ মনের মাঝে সেই স্নেহময়ী জননী আর শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির রূপ কল্পনা করতে বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করি।

রঞ্জিত আমার চেয়ে বছর দুই তিনের বড়। ছ' ফুট লম্বা তার দীর্ঘ ব্যায়াম-পুষ্ট দেহেও ছিল যেমন অসাধারণ শক্তি,

মনেও ছিল অকুতো সাহস। এই জন্য আশপাশের সমস্ত লোকই তাকে ভয় করত, শ্রদ্ধা করত। সত্যি কথা বলতে কি, রঞ্জিত সঙ্গে থাকলে আমি বাঘের গর্ত্তে বা পাগলা হাতীর দলের মধ্যে যেতেও ভয় পাই না।

বাবা হঠাৎ মারা গেলে আমরা দু' ভাই বিদেশে অন্য কোন উপায় না দেখে এই কাজ বেছে নিয়েছি।

* * *

পূর্ব্ব-আফ্রিকার অগ্নিবর্ষী সূর্য্য আকাশপটে দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দূরের বনভূমি স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাছের বনে একদল জেব্রাকে ছুটে পালাতে দেখলুম। দূর উপত্যকা থেকে ক্লান্ত হায়না আর ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ডাকও কাণে এল। এ সমস্ত শোনা অভ্যাস হয়ে গেছে। আফ্রিকার জঙ্গলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বিধাতার চিড়িয়াখানা বললেই বোধ হয় এর ঠিক আখ্যা দেওয়া হয়।

হঠাৎ অদূরে বনের মধ্য থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল—যেন প্রাণভয়ে কেউ ছুটে আসছে। রঞ্জিতকে বললুম, কি ব্যাপার?

রঞ্জিত কোন জবাব দিলে না। ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে তার দোনলা বন্দুকটা তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল—অর্দ্ধ-উলঙ্গ একটি আফ্রিকাবাসী। দেহ তার ক্লান্ত মাথা; স্থানে স্থানে

রক্তও ঝরে পড়ছে। দেখে বললুম, লোকটা মাসাই জাতির।

ভয় কি যন্ত্রণায় জানি না, চীৎকার করতে করতে লোকটা কাছে এসেই রঞ্জিতকে দেখে বলে উঠল, বাওয়ানা···আপনি! তা'হলে আমি বেঁচে গেছি।

লোকটার রক্তাক্ত দেহ দেখে আমি শিউরে উঠলুম; বললুম, রঞ্জিত, লোকটা ভীষণ আহত হয়েছে।···না, না মনের সুখে কেউ চাবুক হাঁকড়েছে দেখছি।

আমার কথা শুনে রাগে লোকটার দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। মাসাই ভাষায় চীৎকার করে সে বলে উঠল, ঠিক, বাওয়ানা। মাসাই সর্দ্দারের ছেলে কারামোজা আমি—আমাকে একটা ওলন্দাজ শূয়োর চাবুক মেরেছে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বে তার প্রহার-ক্লিষ্ট দেহটা স্ফীত হয়ে উঠল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে আবার বললে, চাকার দাগ দেখেই বুঝেছি, এ তোমাদের আগুন-গাড়ীর দাগ। সে হায়না ছুটো আসছে। আমাকে বাঁচাও বাওয়ানা।

একে আমি পূর্ব্বে দেখিনি। রঞ্জিতও চেনে বলে মনে হোল না। কিন্তু রঞ্জিতকে এ যে চেনে—তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

রঞ্জিত প্রশ্ন করলে, তোমায় এরা মারলে কেন, কারামোজা?

—আমি এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হইনি বলে।

—কোথায় ?

—ওয়াবনিদের হাতীর দাঁতের আড্ডায়।

রঞ্জিতের ঠোঁটের উপর দিয়ে মৃদু হাসি খেলে গেল। গোয়াসো নায়েরো নদীর উত্তরে, বহু পূর্ব্বে, ওয়াবনি বলে নাকি একটা জাতি বাস করত ; আজ তাদের চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেলেও, তাদের সঞ্চিত হাতীর দাঁতের ভাণ্ডারের কথা কিংবদন্তীর মতই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, কিন্তু বিশ্বাস আমরা কোনদিনই করিনি। আফ্রিকায় এ রকম গল্প অনেক শোনা যায়।

রঞ্জিত রাগতস্বরে বললে, এই বাজে কাজে যেতে চাওনি বলে, তোমায় চাবুক মারলে তারা ?

চীৎকার করে কারমোজা বললে, হ্যাঁ। পথের সন্ধান আমি জানি। এ সন্ধান আমাকে···

দ্রুত খুরের শব্দে কারামোজার কথা শোনা গেল না। বনের মধ্য থেকে সামালি ঘোড়ায় চড়ে দুটো মূর্ত্তি আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

তাদের কাঁধে বন্দুক, হাতে জলহস্তীর চামড়ার চাবুক। বড়টার একটা কাণ ছোট—মুখময় দাড়ি। ছোটটার দেহটা লম্বা চওড়া হলেও চোখ দুটো ছোট ছোট। দেখেই বুঝলুম, এরাই কারামোজাকে চাবুক মেরেছে।

কারামোজাকে একটা ঠেলা দিয়ে রঞ্জিত বললে, লরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াও কারামোজা।

কারমোজা জায়গা থেকে এক পা'ও নড়ল না। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাদের পানে তাকিয়ে রইল। ওলন্দাজ দুটো ঘোড়া থেকে নেমে আনন্দে চীৎকার করতে করতে কারামোজার দিকে দৌড়ে এল।

ছোটটা বললে, হতভাগাটা এখানে রয়েছে বাবা। তোমায় বললুম, ও এই দিকেই এসেছে।

দাড়িওয়ালা ওলন্দাজ কর্কশ কণ্ঠে বললে, ধরে নিয়ে আয় পিয়েট। চাবকে আজ ওর পিঠের ছাল তুলে ফেলব। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললে, সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া, তোরা এ ব্যাপারে মাথা গলাতে এসেছিস কেন?

রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল। রঞ্জিত এক ঝটকায় মাসাইটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এল। তারপর মৃদু হেসে বললে, অত চটো কেন বন্ধু—দরকার আমার একটু আছে বৈকি। একে মারবার তোমাদের অধিকারটা একটু শুনতে পাই না?

পিয়েট ব্যঙ্গভরে বলে উঠল, অধিকার! তারপর তার বাবার দিকে ফিরে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠে বললে, এরা পাগল হয়েছে বাবা।

বড় ওলন্দাজটা কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, ভন টর্টের হুকুম—সরে দাঁড়া তোরা—নইলে ভাল হবে না বলছি।

রঞ্জিত কিন্তু বিন্দুমাত্র না চটে শান্ত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, মাসাইএর অপরাধটা কি?

—সে কৈফিয়ৎ তোমার কাছে দিতে হবে না কি ? বাড়ীর চাকর বাকর চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে তোমাদের হুকুম নিয়ে ?

—ছুঁচোটা মিথ্যে কথা বলছে, বাওয়ানা—কারামোজা ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল,—মাসাই সর্দ্দারের ছেলে কখনও কারও চাকরী করে না।

আফ্রিকাবাসী সকলেই জানে যে, কোন সর্দ্দারের ছেলে কখনও অপরের দাসত্ব গ্রহণ করে না।

রঞ্জিত আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, আর না। এবার আপনাকে ফিরে যেতে হবে মিঃ টর্ট। কথা কাটাকাটি করে নষ্ট করবার মত সময় আমাদের নেই।

এক ফোঁটা এক বিদেশী ছেলে তাকে বাধা দিতে উদ্যত দেখে টর্ট আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় করে সে রঞ্জিতের দিকে চেয়ে রইল, যেন নিজের কাণকেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য ; পর মুহূর্ত্তেই চাবুকটা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে সে বলে উঠল, মাসাইটাকে না নিয়ে আমি যাব না—না, কিছুতেই না।

বিন্দুমাত্রও না দমে, মৃদু হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে রঞ্জিত বললে, যেতে আপনাকে হবেই—আর সেটা এখুনিই।

লক্ষ্যের শিকারটা ফস্‌কে পালালে হিংস্র জানোয়ার যেমন ক্ষেপে যায়, রঞ্জিতের কথা শুনে, ভন টর্ট তেমনি ক্ষেপে উঠল। চাবুকটা মাথার উপর তুলে ধরে এগোতে এগোতে

আমাকে দেখিয়ে ছেলেকে বললে, পিয়েট, ওই বাচ্চাটাকে তুই ধর। আমি এটাকে…

চট্ করে ফিরে দেখি, পিয়েট আমার দিকে দৌড়ে আসছে। হাতে তার উদ্যত চাবুক। মুখখানা ঠিক হিংস্র শ্বাপদের মতই ভয়ঙ্কর। তাকে আমার উপর লাফিয়ে পড়তে উদ্যত দেখে নীচু হয়ে তার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গেলুম, কিন্তু তার আগেই সতর্ক হয়ে সে থেমে পড়ল আর আমি নীচু হতেই আমাকে জাপটে ধরে দিলে এক আছাড়।

লেগেছিল বেদম! যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠে বসতেই দেখি, রঞ্জিত ওলন্দাজ দুটোর টুঁটি চেপে ধরেছে। তারপর …ঠকাঠক্ করে একটা শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজনে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

কারামোজা উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, বাওয়ানা, আপনার ছুরিটা! চাবুক মারার শোধটা হাতে হাতে তুলে নিই।

তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রঞ্জিত বললে, চাবুক মারার অপরাধে ওদের খুন করা যেতে পারে না কারামোজা। তারপর মৃদু হেসে বললে, মিঃ ভন টর্ট এখন কি বলেন?

গা মাথার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভন টর্ট বিকৃত কণ্ঠে বললে, এই শেষ নয়—আবার আমাদের দেখা হবে। মাসাইএর শাস্তি রইল তোলা, সেই সঙ্গে তোমাদেরও। কথার সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজনে তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে বসল। মুখে সাহস

দেখালেও, দ্বিতীয়বার রঞ্জিতের শক্তি পরীক্ষা করতে বা তাকে ঘাঁটাতে সাহস হোল না তাদের।

রঞ্জিত কোন উত্তর দিল না। পিয়েটের ঘোড়ার পেছনে এক লাথি মারতেই ঘোড়া দৌড়াতে আরম্ভ করল।

—দুই—

ভীমরুলের চাকে

ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রঞ্জিত বললে, ওরা আর আমাদের বিরক্ত করতে আসবে বলে বোধ হয় না—কি বলিস্ সুজিৎ ?

বললুম, না, সে রকম দুর্ব্বুদ্ধি ওদের হবে বলে বোধ হয় না।

রঞ্জিত বললে, একটু তার বের করত, সুজিৎ। কারবুরেটরটা ঝুলে পড়েছে, উঁচু করে দিতে হবে···

আমাদের পিছন ফিরতে দেখেই, কারামোজা, মাসাই কায়দায় অভিবাদন করলে। চোখদুটো তার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় জ্বল্ জ্বল্ করছে। বললে, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, নইলে ওই হায়না দুটো আমাকে চাবুক মেরেই মেরে ফেলত। তারপর যেন উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপই খুসীভরা কণ্ঠে বলে উঠল, চলুন না, আপনার আগুন-গাড়ী নিয়ে আমরাই হাতীর দাঁতের সন্ধানে যাই।

রঞ্জিতের উত্তর শোনবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

রঞ্জিতকে ইতস্ততঃ করতে দেখে সে বললে, বাওয়ানা কি

হাতীর দাঁতের কথা বিশ্বাস করছেন না? কিন্তু ওই 'হায়না' দুটো করেছিল। তারপর একটু থেমে বললে, আপনারা যদি যেতে রাজী না হন, তা'হলে অবিশ্যি আমাকে একলাই যেতে হবে। বাবার এ বছর ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে। তাই তিনি আমাকে হাতীর দাঁতের খোঁজে যেতে হুকুম করেছেন। হাঁটা পথে পায়ে পায়ে বিপদ আছে সত্যি, কিন্তু আগুন-গাড়ীতে ভয় খুব কম।

রঞ্জিত দেখলুম, তখনও নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে। আমার কিন্তু মন আশায়—আনন্দে নেচে উঠল। রঞ্জিতকে এত ইতস্ততঃ করতে দেখে মনে মনে রেগে উঠলুম। মাল বয়ে বেড়ালে সারা জীবনে দুঃখ কোন দিনই ঘুচবে না—কিন্তু যদি সত্যিই হাতীর দাঁত পাওয়া যায়! পথ দুর্গম স্বীকার করি, কিন্তু সেই ভয়ে ত রঞ্জিতের পিছিয়ে পড়া সাজে না। লোভে পড়ে এর আগে অনেক লোকই প্রাণ দিয়েছে সত্যি, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই ত পথের সন্ধান জানত না।

আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেই যেন রঞ্জিত বললে, একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? তুই কি বলিস্ সুজিৎ?

আনন্দে আমার বুকের ধুকধুকানি যেন থেমে গেল। ব্যস্ত ভাবে বললুম, কখন তবে যাত্রা আরম্ভ করছ?

আমার ব্যস্ততা দেখে রঞ্জিত হেসে বললে, তুই যে রকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস্ তাতে এখুনি গেলেই খুসী হোস্, কিন্তু কি করব

—পথের জন্যে তেল, খাবার, আর যে সব জিনিষ দরকার হতে পারে, সেগুলো কেনবার সময়টুকু পর্য্যন্ত তোকে ধৈর্য্য ধরে থাকতেই হবে।

নিজের ব্যস্ততার জন্য লজ্জিত হলুম, কিন্তু রঞ্জিতের কথার ভঙ্গী শুনে, না হেসে থাকতে পারলুম না।

রঞ্জিত ঠিকই বলেছিল। কারবুরেটরটার সদ্গতি হোলে লরী চলতে সুরু করল। আমাদের খাবার মাংস ফুরিয়ে গিয়েছিল, রঞ্জিত দেখলুম, দুধারে হরিণের খোঁজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে।

জোরে লরী চালিয়েছি, ছোট ছোট ঝোপ ভেদ করে লরী ছুটে চলেছে। লরীর কাণে তালা ধরান শব্দে, জেব্রার দল দূরে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কারামোজা চীৎকার করে উঠল, বাওয়ানা, হরিণ! আপনি হরিণের কথা বলছিলেন না?

কারামোজার নির্দ্দেশ অনুসরণ করে দেখলুম, ঘন লম্বা ঘাসের ওধারে, ঝোপের মধ্যে দুটো বল্‌গা-হরিণ—প্রায় গাধার মত বড়।

রঞ্জিত বললে, গাড়ী থামা সুজিৎ। আজকের খাবারের যোগাড় করতে মিনিট পনেরোর বেশী লাগবে বলেমনে হয় না।

গাড়ী থামিয়ে বন্দুক হাতে দু'জনে নেমে পড়লুম। কারামোজা লাফিয়ে নামতে গেল, কিন্তু পারলে না। চাবুকের আঘাতে তার সর্ব্বাঙ্গ ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে।

রঞ্জিত বললে, থাক, কারামোজা, তোমাকে আর নামতে হবে না। তুমি গাড়ীতে বস, আমরা এখুনি আসছি।

কারামোজাকে গাড়ীর পাহারায় রেখে আমরা ঘাসের বনে নীচু হয়ে ঢুকে পড়লুম।

তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি—কতবড় বিপদের মধ্যে পা বাড়াচ্ছি।

ঘন ঘাসের মধ্যে দিয়ে দু'জনে এগোতে লাগলুম, আঙুল বন্দুকের ঘোড়ায় লাগানোই ছিল। আফ্রিকার জঙ্গলে বিশ্বাস নেই, যে কোন সময়ে বিপদ ঘটতে পারে।

হঠাৎ রঞ্জিত থেমে পড়ল। বললুম, রাস্তা হারিয়ে ফেললে না কি?

রঞ্জিত চাপাস্বরে বললে, চুপ, কিছু শুনতে পাচ্ছিস্ না?

কাণ পেতে শোনবার চেষ্টা করলুম। দুটো কাঠ ঘসার মত শব্দ এল কাণে—মোষের ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজও। বললুম, মোষ।

রঞ্জিত চুপি চুপি বললে, একটা নয়—একদল।

রঞ্জিতের কথা যে সত্যি তা প্রমাণ হতে বেশী দেরী হোল না। সামনে, পেছনে, চারিদিক থেকে আমরা মোষের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনতে পেলুম।

রঞ্জিত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, আমরা মোষেদের চাকের মধ্যে এসে পড়েছি, সুজিৎ। আফ্রিকার এই বুনো মোষের দল যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ।

= তিন =

অদৃশ্য

বুঝতে আমাদের দেরী হোল না যে, আফ্রিকার দুপুর বেলা সূর্য্যের দগ্ধকারী তাপ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে একদল মোষ এই ঘাসের বনে প্রবেশ করেছে। এরা নিশাচর। দিনের বেলা যেখানে বিশ্রাম করে, সেখানে মানুষ বা পশু যে কোন প্রাণীই উপস্থিত হোক না কেন, এদের হাতে তার নিস্তার নেই।

আমাদের সবচেয়ে বিপদ হয়েছিল এই যে, দলটা যে কত বড় তা বোঝবার কোন উপায় ছিল না। শুধু শিং ঘসা আর জন্তুগুলোর ডাক বিঁধে-থাকা-কাঁটাটির মতই আমাদের ক্রমাগত মর্ম্মে মর্ম্মে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে, চক্রব্যূহের মধ্যে পড়েছি আমরা।

রঞ্জিত চাপা গলায় বললে, যাই হোক, আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে সুজিৎ। চুপিসাড়ে চলে আয়।

আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল, বললুম, সামনের দিকে ?

রঞ্জিত বললে, হ্যাঁ। ভগবান্ জানেন, আমাদের পেছনে কতগুলো আছে। তবে এখনও ওরা আমাদের অস্তিত্ব টের

পায়নি। কিন্তু আমাদের গায়ের গন্ধ একবার নাকে গেলেই রাগে অন্ধ হয়ে তেড়ে আসবে। তারপর একটু থেমে, ম্লান হেসে বললে, কারামোজার হাতীর দাঁত থাকবে ভাঁড়ারে তোলা, লাভে হতে শিংএর সিংহাসনে চড়িয়ে তোমার মোষ প্রভুরা আমাদের একেবারে সশরীরে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

অত্যন্ত সাবধানে আমরা অগ্রসর হলুম। চলার পথে সমস্ত শুক্‌নো ডাল পালা তুলে দূরে দূরে ফেলে দিতে লাগলুম, পাছে মাড়িয়ে ফেললে শব্দ হয়ে ওঠে। ঘাসের বনের ভেপ্‌সা গরমে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছিল।

এ ছাড়া আর আমাদের উপায়ই বা কি? এক—আর না এগিয়ে মোষের দল চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত ঐখানে বসে অপেক্ষা করা। কিন্তু তা অসম্ভব। অন্ততঃ একটাও হরিণ মেরে আমাদের এখনিই লরীতে ফিরতে হবে; কারামোজা সেখানে একা আছে।

হঠাৎ রঞ্জিত আমার কাঁধটা নাড়া দিয়ে দূরে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—ঘন ঘাসের ফাঁকে একটা প্রকাণ্ড মোষের লম্বা লম্বা শিং শুদ্ধ মাথাটা নড়ছে। নাক দুটো স্ফীত করে সে যেন বাতাসে কিসের গন্ধ শুঁকছে।

বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। পায়ে টান পড়তে চেয়ে দেখি, রঞ্জিত মাটিতে শুয়ে পড়ে আমকেও শোবার জন্যে ইঙ্গিত করছে। বুঝলুম, বন্দুক ছোড়া মিথ্যা।

হয়ত সমস্ত দলটাই তাতে তেড়ে আসবে। উপায়ান্তর না দেখে সামনেই শুয়ে পড়লুম!

কিন্তু বৃথাই! সেই মুহূর্ত্তে মোষটা বাতাসে আমাদের গন্ধ পেয়ে লাফিয়ে উঠল। হয়ত আমাদের দেখতে পেয়েও থাকবে, কারণ পরক্ষণে দেখি, মাথা নীচু করে শিং উঁচিয়ে আক্রমণ করতে আসছে বিকট গর্জ্জনে। সেই বিকট গর্জ্জনে সমস্ত বনভূমিটা যেন কেঁপে উঠল। বন্দুকটা তাড়াতাড়ি কাঁধে তুলে নিয়ে দৈত্যটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লুম। গুলির শব্দ শূন্যে মিলিয়ে যাবার আগে সে শব্দ ছাপিয়ে চারিদিক থেকে ভেসে উঠল মোষের গর্জ্জন।

গুলিটা আমার মোষটার গায়ে লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু কোন ফল হল না; সেই রকম প্রচণ্ড বেগেই সে আমাদের দিকে দৌড়ে আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি বন্দুকটায় টোটা ভরে চেয়ে দেখি, মোষটা মাত্র গজ পনেরো দূরে। সাক্ষাত যমদূত সম্মুখে! বুকের রক্তটা যেন হিম হয়ে গেল! ভয়ে চোখ মুদে ফেললুম। হঠাৎ আমার কাঁধের উপর দিয়ে রঞ্জিতের বন্দুক থেকে পর পর দুটো গুলি ছুটল। দৈত্যটা সেইখানেই অর্ত্তনাদ করতে করতে লুটিয়ে পড়ল। সবেমাত্র তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বন্দুকটায় গুলি ভরচি, এই সময় তাকিয়ে দেখি, জানোয়ারটা নিমেষে লাফিয়ে উঠে রক্তাক্ত দেহে আমাকে লক্ষ্য করে তেড়ে আসছে। আফ্রিকার বুনো মোষ দু' দশটা গুলি অতি সহজেই হজম করতে পারে।

আর রক্ষা নাই! শিয়রে নিশ্চিত মরণ। মনে মনে ইহলোকের প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলুম। ক্ষুব্ধ মোষটার তপ্ত নিঃশ্বাস আমার পা'টাকে যেন ঝলসে দিলে। ভয়ে নিশ্চয়ই কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম। দূরে রঞ্জিতের বন্দুকের গর্জ্জনটা মেঘ-গর্জ্জনের মতই আমার কাণে এসে লাগল, আর সেই সঙ্গে মনে হল, কে যেন ধরে আমাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। বন্দুকটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল

সমস্তটাই যেন আমার কাছে রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত বোধ হতে লাগল। রাগে অন্ধ হয়ে ক্ষিপ্ত মোষের দল গর্জ্জন করতে করতে চারদিকে অদৃশ্য শত্রুর সন্ধানে ছুটচে। আতঙ্কের ঘোরটা কাটলে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে চারদিকে রঞ্জিতের সন্ধানে দেখতে লাগলুম। বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটছে···দেখতে পেলুম, টোটাশূন্য বন্দুকটা হাতে করে রঞ্জিত দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখে রঞ্জিত বলে উঠল, মোষটা আবার তেড়ে আসছে।

সত্যিই প্রতিহিংসাপরায়ণ মোষটা উঠে প্রাণপণ শক্তিতে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

—ছুটে আয় সুজিৎ, বলে রঞ্জিত আমার হাতে একটা টান দিয়ে অগ্রসর হোল। সৌভাগ্যের বিষয়—ক্রোধে অন্ধ অন্য মোষগুলোকে এড়িয়ে আমরা ঘাসের বনের বাইরে

এলুম। আহত মোষটা কিন্তু তখনও আমাদের পেছন পেছন তাড়া করে আসছে।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রঞ্জিত বন্দুকে ছ'টো টোটা ভরে নিলে। তারপর তার বন্দুকটা পর পর ছ'বার গর্জ্জে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মোষটা মাটীতে লুটিয়ে পড়ল—স্থির, নিস্পন্দ হয়ে।

প্রায় দেড় টন ওজনের সেই কাল মাংসের ঢিপিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রঞ্জিত বললে, হরিণের দল এত কাণ্ডের পর নিশ্চয়ই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে—তাদের আশা বৃথা! পনের মিনিটের জায়গায় এদিকে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ও নষ্ট হোল। মোষের দল চলে গেছে। সুজিৎ, চল্, তোর বন্দুকটা খুঁজে নিয়ে ফিরে যাই।

আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল; বললুম, আফ্রিকায় এক মিনিট পরে কি ঘটবে তা যখন জানা নেই, তখন সময়ের হিসাব করা মূর্খতা।

রঞ্জিত হেসে বললে, ঠিক! কিন্তু আর দেরী নয়, চল্, কারামোজাকে বলতে হবে যে, আমাদের খাবার চার পায়ে দৌড়ে পালিয়েছে, কাজেই ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

* * *

অল্পক্ষণ বাদেই উই ঢিপিটার কাছে উপস্থিত হলুম। কিন্তু একী! না আছে সেখানে কারমোজা—না আমাদের

লরীখানা। চীৎকার করে ডাকলুম, কারামোজা— কারামোজা! কিন্তু বৃথাই! কোন সাড়া-শব্দ পেলুম না। রাগে—দুঃখে আমার নিজের গালেই চড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বললুম, রঞ্জিত, আমরা বোকা! কারামোজা ঐ ওলন্দাজ ডুটোর চর সেজে আমাদের লরীটা হাত করে নিলে।

রঞ্জিত কোন কথা বললে না। চারদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ বলে উঠল, যেখানে আছিস, ঠিক ওই খানেই দাঁড়িয়ে থাক্ সুজিৎ, এক পা'ও নড়িস নি।

রঞ্জিতের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। চারদিকে তাকিয়ে সন্দেহজনক কোন কিছু নজরে পড়ল না। বন্দুকটা কাঁধে ফেলে রঞ্জিত এদিকে হেঁট হয়ে ব'সে মাটিতে পায়ের দাগ খুঁজতে ব্যস্ত। অল্প দূরে যে ছোট পাহাড়টা ছিল, তারই তলায় গিয়ে রঞ্জিত হেসে উঠল; চেঁচিয়ে বললে, কারামোজা, ভয় নেই, নেবে এস।

পাহাড়ের ওপর থেকে উত্তর ভেসে এল, যাচ্ছি, বাওয়ানা।

একটু পরেই কারামোজা পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এসে বিস্মিত স্বরে বললে, আমি যে ওপরে আছি, জানলেন কেমন করে বাওয়ানা?

কারামোজা যে বিশ্বাসঘাতক নয়—এটা জেনে মন আমার আনন্দে ভরে উঠল।

রঞ্জিত বললে, আমাদের লরীটা কেড়ে নিয়ে ওলন্দাজ ডুটো তোমাকে ধরতে চেষ্টা করেছিল, না?

রাগে কারামোজার চোখ দুটো ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল। বললে, ঠিক তাই, আপনারা চলে যাবার একটু পরেই ওলন্দাজ দু'টো ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির। প্রথমে তাদের গোটাকতক ঘুসি লাগিয়েছিলুম, কিন্তু তারা বন্দুকগুলো লাঠির মত চালাতে লাগল। কতক্ষণ আর খালি হাতে তাদের বাধা দেওয়া যায়, তাই আমাকে পালাতে হোল।

রঞ্জিত বললে, তুমি ঠিকই করেছ কারামোজা। ওদের হাতে ধরা না দেওয়াই তোমার বুদ্ধিমানের মত কাজ হয়েছে—ক্ষতি তাতে যাই হোক না কেন।

—পাহাড়ের ওপর পর্য্যন্ত তারা আমায় তাড়া করেছিল, তারপর বোধ হয়, দূরে আপনাদের দেখতে পেয়ে পালিয়েছে। আমি অনেক ওপরে ছিলুম বলেই আপনাদের দেখতে পাইনি।

মনটা কিন্তু আমার ব্যথায় কির্ কির্ করছিল; ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললুম, লরীটা পেয়েছে—এখন ওরা আমাদের চেয়ে অনেক—অনেক আগে চলে যাবে।

রঞ্জিত কোন কথাই কইলে না। রাইফেলটা কাঁধে ফেলে নীরবে এগিয়ে চললো—সময় সে আর বাজে নষ্ট করবে না।

আমরাও ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ করলুম। যে পথে লরীটা গেছে—সেই পথ ধরে যেতে যেতে রঞ্জিত বললে, আমাদের লরীর চেয়েও ভন টর্ট মশাই কারামোজাকে চান বেশী। কেননা কারামোজাই তাঁকে হাতীর দাঁতের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারবে। তাই শিকারের আশায় পথের আশে

[illegible] ৩৬ [০১] ৫৩

ওৎ পেতে থাকা তাঁর আশ্চর্য্য নয়। তুই বরং খানিকটা কারামোজার আগে খানিকটা পেছনে এই ভাবে আয়।

ষ্টীমারের সার্চ্চ লাইটের মত সতর্ক দৃষ্টিটা শত্রুর সন্ধানে একবার এদিক, একবার ওদিক ফেলতে ফেলতে আমরা অগ্রসর হলুম। হঠাৎ রঞ্জিত থেমে পড়ে বললে, সোজা পথে না গিয়ে আমরা এই বনের মধ্যে দিয়ে যাব। কিছুদূরে নান্দিদের গ্রাম। সেইখানে গিয়ে নান্দি-সর্দ্দারের কাছে জানতে পারব—ভন টর্ট তাদের গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গেছে কিনা। সর্দ্দার লোকটি একটি বাস্তু-ঘুঘু। তাহলেও তার সঙ্গে আমার যথেষ্ট চেনা আছে আর তাকে কি করে বশ করতে হয়, তাও আমি জানি।

সোজা পথে গিয়ে তাদের পাতা ফাঁদে পা দেওয়ার চেয়ে রঞ্জিতের এই ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হোল।

রঞ্জিত বললে, বনের পথ অবশ্য ঘুরে গেছে অনেকটা, তবু নিরাপদ বলেই মনে হয়। রঞ্জিতের কথা যে একটুও অতি-রঞ্জিত নয়, তার প্রমাণ পেলুম হাতে হাতে।

তিনজনে ঘণ্টাচারেক অক্লান্ত ভাবে চলবার পর দুপুর বেলা যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম, নান্দিগ্রাম সেখান থেকে তখনও অনেক দূরে। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে ; ক্লান্ত পা'গুলো আর চলতে চাইছে না। শুধু পথের মনোরম দৃশ্য আমাদের চলবার প্রেরণা যোগাচ্ছিল। পাহাড়ের বুকচেরা, রূপালী পাতের মত ঝিরঝিরে ঝর্ণা, উপত্যকার মাঝে মা[illegible]

ছোট গ্রামগুলো ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল। এত কষ্টের মধ্যেও রঞ্জিত ত কোথা থেকে শেখা একটা কবিতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে সুরু করে দিলে ঃ

ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! সুন্দরী ঝর্ণা !
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-বর্ণা !
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুণ্ডলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা !
ঝর্ণা !

আমরা নিঃশব্দে পথ চলছিলুম। কবিতা থামিয়ে হঠাৎ রঞ্জিত বলে উঠল, আমাদের পথ চেয়ে বসে থেকে থেকে ভন টর্ট আর পিয়েট নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে খাদ্য আর সাহায্যের জন্যে নান্দিদের গ্রামে যাবে, তখন···

তখন যে কি হবে তা ভেবে আমি যথেষ্ট উল্লসিত হয়ে উঠলুম।

চলতে চলতে কারামোজা আমাদের হাতীর দাঁতের কথা বললে। তুহিন-শীতল হিমের প্রদেশ ছাড়িয়ে পিশাচ-দানার হ্রদ। হ্রদ পেরিয়ে একটা পাহাড়—অনেকটা মানুষের মুণ্ডুর মত দেখতে। সেই পাহাড়ের পেছনের বনে লুকানো হাতীর দাঁত আছে। পথটা ঠিক সে চেনে না বটে, কিন্তু উত্তর দিকে যে বুনোরা বাস করে—তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল ; তখনও আমরা চলেছি। দেখতে দেখতে দূরে—পাহাড়ের পেছনে রক্ত-রাঙ্গা সূর্য্য ডুবে গেল। আফ্রিকায় গোধূলি নেই। তাই সূর্য্যের শেষ-রশ্মির সঙ্গে পৃথিবীর বুকের ওপর নেমে এল অন্ধকারের গাঢ় যবনিকা। এত অন্ধকার যে, সামনে রঞ্জিত বা পাশে কারামোজা—কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলুম না। দিনের বেলা যে কারামোজাকে সিংহের মত সাহসী দেখা গিয়েছে, এখন দেখি সে সন্দিগ্ধভাবে চারদিকে চাইছে। জন্মগত সংস্কারবশে হয়ত ভাবছিল, অন্ধকার থেকে ভূত-প্রেতের দল বেরিয়ে এসে এখনই বুঝি বা তার কাঁধে চেপে বসবে।

অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে চলেছি তিনজনে। পায়ের তলা দিয়ে কত কি সড় সড় করে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝোপের মধ্যে থেকে একটা হরিণ লাফিয়ে বেরিয়ে এল—শিকারী চিতার গন্ধ সে টের পেয়েছে।

নিঃশঙ্ক শান্তির পরিবেষ্টনী ছেড়ে আজ আমার প্রথম অরণ্য-বাস। আফ্রিকার রহস্যে ভরা অরণ্যের বিচিত্র হাঁক-ডাক মনে আনন্দ ও ভয়ের শিহরণ জাগিয়ে তুলছিল আর কারামোজার অদ্ভুত ভয় জাগিয়ে তুলছিল বিস্ময়।

হঠাৎ কারামোজা দাঁড়িয়ে পড়ে হাতের আঙ্গুলগুলো মট্ মট্ করে মটকাল। আদিম অধিবাসীদের বিপদের সঙ্কেত হলো এই। রঞ্জিত শুনেই দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকে হাত দিয়ে আটকালে।

তিনজনেই আমরা স্থির হয়ে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু পরেই চাঁদের আলোয় একটা হাতীর মুণ্ড ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। কাণগুলো তার কুলোর মত; বাঁকা তলোয়ারের মত বড় বড় দাঁত দু'টোয় লতা-পাতা জড়ান; বিপদের আশঙ্কায় শুঁড়টা শূন্যে তুলছে। রঞ্জিত চুপি চুপি বললে, নড়িস্ নি সুজিৎ, আমাদের গন্ধ পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

রক্ষে যে থাকবে না—তা বেশ জানি। বুনো মোষের কথা এরই মধ্যে ভুলিনি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাতীটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলুম। ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতই জন্তুটা আমাদের পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে শুঁড় দুলিয়ে বাতাস শুঁকছে। হঠাৎ দেখি, রাস্তা খালি—হাতী নেই। আশ্চর্য্য! ধূমকেতুর মত যেমন হঠাৎই সে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ চলে গেছে। শুধু পথ খালি করে যাওয়া নয়ত, মনে হল আমাদের বুক খালি করে নেমে গেছে।

খুসীভরা কণ্ঠে রঞ্জিত বললে, ভগবানকে ধন্যবাদ! যতক্ষণ ও পথে দাঁড়িয়ে থাকত, ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতেই হোত। নান্দিদের গ্রাম আরও আধ ঘণ্টার পথ; আয়, আর দেরী করিস নি।

বন্দুকটা কাঁধে ফেলে রঞ্জিত নির্ব্বিকার চিত্তে গ্রামের পথে আবার তার লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে দিলে।

চার

ঘেড়াজাল

বাইরের শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে আফ্রিকার অসভ্য অধিবাসীরা অনেকেই তাদের গ্রামের চারদিকে কাঠের প্রাচীর দিয়ে রাখত। নান্দিদের গ্রামেও দেখলুম তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাঠের বেড়া ঠেলে আমরা যখন গ্রামের ভেতর প্রবেশ করলুম, শরীর তখন সকলের অবসাদে ভেঙ্গে আস্‌ছে। চারদিকে ছোট গোল গোল কুঁড়ে; মাঝখানে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড; তারই চারদিক ঘিরে সর্দ্দার আর তার চেলা চামুণ্ডারা বসে আছে। সমস্তটাই আমার চোখে ঠেকল অদ্ভুত।

সোজা সর্দ্দারের কাছে গিয়ে বন্দুকটার ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে রঞ্জিত বললে, সর্দ্দার, তোমায় দেখতে এলুম।

সর্দ্দারও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তোমাকেও বহুদিন বাদে দেখলুম, বাওয়ানা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বোস, বাওয়ানা। তোমাদের আসার খবর আমি আগেই পেয়েছি। তাই তোমাদের খাবার তৈরী করছি। কিন্তু হেঁটে কেন, তোমার আগুন-গাড়ী গেল কোথায়?

রঞ্জিত একটা কাঠের ওপর বসে আমাকে আর একটাতে বসতে বললে। কা[illegible] আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াল। নান্দিদের সে পছন্দ করত না বটে, কিন্তু মাসাই জাতির মতই নির্ভীক বলে এদের শ্রদ্ধা করত।

ঈষৎ হেসে রঞ্জিত বললে, আমাদের আগুন-গাড়ীটা চুরি হয়ে গেছে সর্দ্দার! দু'টো ওলন্দাজ সেটা চুরি করেছে।

চোখ দু'টো বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে সর্দ্দার বললে, বল কি? চুরি গেছে! চোর ধরতে পারনি?

রঞ্জিত বললে, তারা যখন এ পর্য্যন্ত তোমার গ্রাম ছাড়িয়ে যায় নি, তখন ধরতে পারব বলেই ত মনে হয়। আমরা এইখেনেই লুকিয়ে থেকে তাদের ধরব। শোন সর্দ্দার! রঞ্জিত সর্দ্দারের হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বললে, ওলন্দাজ দুটোর সঙ্গে বোঝা-পড়া আমি নিজে করতে চাই। আমরা আগুন-গাড়ী যাবার পথের ধারে বসতে যাচ্ছি। যদি তারা গাড়ীতে না এসে আমাদের অজান্তে তোমার এখানে আসে, তবে তাদের খেতে দিও। তুমি তাদের কিছু বোল না, শুধু আমাকে একটা খবর পাঠিয়ে দিও। বুঝলে?

—তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি, বাওয়ানা।

—আচ্ছা, তা'হলে আমরা চললুম

—তোমরা খাবে না, বাওয়ানা? বা একটু বিশ্রাম?

—এখন নয় সর্দ্দার! রঞ্জিত বললে।

—বিশ্রাম তোমাদের করতেই হবে।

সর্দ্দারের বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমরা চমকে উঠলুম। চেয়ে দেখি, কিসের আনন্দে তার চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লাল কম্বলের তলা থেকে সর্দ্দার একটা চক্‌চকে ছোরা বের করল। তার মুখ থেকে বন্ধুত্বের মুখোস অনেক আগেই খুলে পড়েছে।

রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলে উঠল। বন্দুকটা তুলে সর্দ্দারকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে যাব—ঘরের মধ্যে থেকে একটা স্বর ভেসে এল: এক পা' নড়িস নি হতভাগারা! নড়েছিস্‌ কি তোদের মাথার খুলি উড়ে গেছে।

রঞ্জিত আমাকে একটা টান দিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলে। দেখি সে রাগে কাঁপছে। গলাটা চেপে বললে, এত অল্পেই ধৈর্য্য হারালে চলবে না, সুজিৎ। অন্ততঃ এইটুকু সময়ের জন্যেও ওরা আমাদের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে। তারপর কতকটা আপন মনেই বলে উঠল, মূর্খ সর্দ্দার! এর মূল্য তোমাকে দিতে হবে।

সর্দ্দার তার অনুচরদের ফটক বন্ধ করে দেবার আদেশ করলে। এতক্ষণ অন্ধকারে যে সব ছায়ামূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দৌড়ে গিয়ে তারা কাঁটা ঝোপ দিয়ে পথ রুদ্ধ করে দিলে।

এতক্ষণ পর আমাদের পালানোর সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হয়েই ভন টর্ট ধীরে ধীরে এগিয়ে এল—পাশে তার ছেলে পিয়েট। দু'জনেরই হাতে উদ্যত বন্দুক,—ভাবটা বাধাদানের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেই মৃত্যু অনিবার্য্য।

উচ্চ হাস্য করে ভন টর্ট বললে, ওরে হাঁদা কেলটে ভূতের দল! বলি— জিতল কে? কাণার মত তোরা আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিস্—এবার?

ঘৃণার সঙ্গে রঞ্জিত উত্তর করলে, খুব বাহাদুরী হচ্ছে! আমাদের জব্দ করবার জন্যে এই সব অসভ্যদের সাহায্য নিতে লজ্জা হল না? তোমার মত সাহসী বীর পুরুষের যোগ্য কাজই বটে!

হা হা করে বীভৎস হাসি হেসে ভন টর্ট বললে, থামাও, থামাও বাপু, তোমার বক্তিমেটা। শুনলে খুসী হবে বোধ হয় যে, তোমাদের লরীটা আমি এখানে এনে রেখেছি। কারা-মোজাকে তাতে করে নিয়ে হাতীর দাঁতের সন্ধানে চললুম। সর্দ্দারই তোমাদের অতিথি সৎকার করবে। তবে এখান থেকে জ্যান্তে পালাতে পারবে—সে আশা ক'রো না।

এতক্ষণে সমস্ত ঘটনাটা পরিষ্কার হোল। আমাদের আগেই এখানে এসে ভন টর্ট নান্দি-সর্দ্দারকে হাত করেছে। সর্দ্দার ভাল কথায় আমাদের হাত করবার মতলবে ছিল। কিন্তু রঞ্জিতের ব্যবস্থায় তার মতলব ফেঁসে যায় দেখে, কপট ভদ্রতার মুখোস ত্যাগ করেছে।

কিন্তু আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। শুনলুম, বিকট চীৎকার করে ভন টর্ট বলছে, মাসাই কুকুরটাকে ধরে নিয়ে আয় পিয়েট।

কথাটা কাণে যেতেই কারামোজা চঞ্চল হয়ে উঠল;

হয়ত সে পালাবার সুযোগ খুঁজছিল; কিন্তু সঙ্গে [illegible] দিক থেকে বর্শা হাতে নান্দিরা এসে তাকে ঘিরে ফেললে। দুটো নান্দি আমাদের বন্দুকগুলো কেড়ে নিতে এল। এই রকম অসহায়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করা আমার অসহ্য মনে হচ্ছিল, কিন্তু চারদিকে অসংখ্য নান্দি দেখে, আর রঞ্জিতের উপদেশ স্মরণ করে নিজেকে সামলে নিলুম। চেয়ে দেখি, সর্দ্দারের মুখে পৈশাচিক হাসি। কিন্তু রঞ্জিত—রঞ্জিত কি কিছু করতে পারবে না? একপাশে সে স্থির হয়ে বসে ছিল, মুখে তার মৃদু হাসি। কারামোজার দিকে চেয়ে সহসা সে গম্ভীর স্বরে বললে, কারামোজা, ওদের সঙ্গে চলে যাও তুমি।

রঞ্জিতের কথা শুনে আশ্চর্য্য হলুম। নিজের কাণকে যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। রঞ্জিত…রঞ্জিত আত্ম-সমর্পণ করবে!

কারামোজা রাগে ফুলছিল। রঞ্জিতের কথা কাণে যেতেই হতভম্বের মত একবার তার দিকে তাকালে, তারপর ধীরে ধীরে ওলন্দাজগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। রঞ্জিতের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

বিজয়ীর অট্টহাসি হেসে ভন টর্ট বললে, দাঁড়া, কুকুর, দাঁড়া।

তারপর স্বরটা নামিয়ে এনে বললে, পিয়েট, লরীটা এগিয়ে নিয়ে আয়। সর্দ্দার ও দু'টোকে যখন শেষ করবে, তখন আমরা আর তার সাক্ষী থাকতে চাই না।

পিয়েট গাড়ী আনতে চলে গেল। একা ভন টর্ট তার বন্দুকটা নিয়ে আমাদের পাহারা দিতে লাগল। সর্দ্দার তার লাল কম্বলে দেহ আবৃত করে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কারামোজা পাথরের মত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে ওলন্দাজদের দিকে এবং মাঝে মাঝে নান্দিদের দিকে তাকাচ্ছে।

পাশে বসে রঞ্জিত—মুখ তার শান্ত, উদ্বেগহীন। ভাগ্যের হাতে সে যেন সকল চিন্তা, সকল কাজ সমর্পণ করেছে।

একটু পরেই ইঞ্জিনের ঘর্ঘর শব্দে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। পিয়েট লরীর ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, সব ঠিক বাবা।

ভন টর্ট কারামোজাকে লরীতে উঠতে আদেশ করে বললে, বিদায় হতভাগ্যের দল! সর্দ্দারের হাতে তোদের দিয়ে, আমি হাতীর দাঁতের সন্ধানে চললুম।

রঞ্জিত কোন উত্তর দিলে না, যেন সে শুনতেই পায়নি। অন্ধকারে দলে দলে নান্দিরা নিঃশব্দে পাহারা দিচ্ছে। কারামোজা কয়েক পদ গিয়েছে, এমন সময় রঞ্জিত যেন সচেতন হয়ে উঠল। হঠাৎ মাসাই ভাষায় কারামোজাকে কি যেন আদেশ করলে। এ ভাষা আমার কাছেও যেমন, নান্দি আর ওলন্দাজদের কাছেও ঠিক তেমনই দুর্ব্বোধ্য।

কারামোজা বোধ হয় রঞ্জিতের আদেশ বুঝল, কারণ পরমুহূর্ত্তে কি যেন বলে, সে উর্দ্ধশ্বাসে পেছন দিকে ছুটল। সঙ্গে

সঙ্গে সামনেই যে নান্দিটা দাঁড়িয়েছিল, রঞ্জিত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, সুজিৎ, বন্দুকগুলো কেড়ে নে।

প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে রঞ্জিত নান্দিটাকে ভূতলশায়ী করে তার লাঠিটা কেড়ে নিলে। আমিও অতর্কিতে অপর নান্দিটার হাত থেকে বন্দুক দু'টো কেড়ে নিলুম। এমনই বিদ্যুদ্‌গতিতে এ গুলো ঘটল, যে নান্দি ও ওলন্দাজগুলো মুহূর্ত্তের জন্যে হতচকিত হয়ে পড়ল।

তারপরেই জালে-বদ্ধ আমাদের দিকে অন্ধকার কুঁড়েগুলোর ভেতর থেকে দলে দলে লোক চীৎকার করতে করতে ছুটে আসতে লাগল।

পাঁচ

মুক্তি

সমস্ত চীৎকার ছাপিয়ে সর্দ্দারের বজ্রগম্ভীর স্বর ভেসে এল : ওদের জ্যান্ত ধর ; এত সহজ মৃত্যু ওদের দোব না।

ঠিক সেই সময়ে একটি ছায়ামূর্ত্তি তাদের পাশ দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আগুনের দিকে ছুটে চলল।—সে মূর্ত্তি যে কারামোজার, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হোল না। সর্দ্দারকে অল্প ধাক্কা দিয়ে সে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে একটা বাক্স ফেলে দিলে।

ওলন্দাজ দু'টো আতঙ্কে চীৎকার করে উঠতেই উদ্যত বর্শা হাতে সর্দ্দার কারামোজাকে আক্রমণ করলে। তার আক্রমণ এড়িয়ে কারামোজা তাকে ধরে ফেললে, তারপর দু'জনে জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে অগ্নিকুণ্ড থেকে অনেকটা দূরে চলে গেল। নান্দিগুলো আমাদের ধরবার চেষ্টায় যখন রঞ্জিতের বজ্র-মুষ্টির আস্বাদ লাভ করছিল, সেই সময় হঠাৎ এক ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ হোল।

বিস্ফোরণের শব্দে সচকিত হয়ে ফিরে দেখি, চতুর্দ্দিকে গুলি ছুটছে আর অগ্নিকুণ্ডের কাঠগুলো চারদিকে হাউই-বাজীর মত উড়ে যাচ্ছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত গ্রামখানি ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। জনকয়েক নান্দি দেখি, মাটিতে পড়ে ছটফট করছে।

উল্লসিত হয়ে রঞ্জিত বললে, সুজিৎ, আমি এখন ঐ ওলন্দাজ দু'টোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চললুম।

এতক্ষণে বুঝলুম, রঞ্জিত মাসাই ভাষায় কারামোজাকে লরীর পিছন থেকে বন্দুকের গুলির বাক্সটা এনে আগুনে ফেলে দিতে বলেছিল। কারামোজাও চমৎকার ভাবে কার্য্যোদ্ধার করেছে। হঠাৎ এই রকম ভাবে বিপদের সম্মুখীন হওয়াতে নান্দিরা প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পরক্ষণেই যারা অক্ষত দেহে ছিল, নূতন উদ্যমে তারা আমাদের আক্রমণ করতে ছুটে এল।

ব্যূহমুক্ত হয়ে রঞ্জিত বীর-বিক্রমে সমবেত নান্দিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিকট চীৎকারের সঙ্গে সে একে একে চারটে নান্দিকে ভূতলশায়ী করলে।

কিন্তু এভাবে যে বেশীক্ষণ চলতে পারে না—তা বোধ হয় সেও বুঝতে পারল। এদের সকলকে হারিয়ে ভন টর্ট আর পিয়েটকে ধরা অসম্ভব দেখে সে বললে, সুজিৎ, তুই দৌড়ে গিয়ে লরীটাকে এগিয়ে নিয়ে আয়, আমি আর কারামোজা চলন্ত···

নান্দিদের বিকট চীৎকারে রঞ্জিতের বাকী কথাগুলো আর শোনা গেল না। আমিও আর অপেক্ষা না করে গাড়ীর উদ্দেশে ছুটলুম। গাড়ীর কাছে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বর্শা আমার গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। চেয়ে দেখি, গাড়ীর পেছনে

একজন নান্দি। সজোরে তার মাথায় বন্দুকের এক আঘাত করতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল। কারণ পিয়েট বা ভন টর্ট বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, আমরা আবার লরীটা অধিকার করতে পারব। তাড়াতাড়ি গাড়ীটা চালিয়ে রঞ্জিতের কাছে নিয়ে এলুম।

কারামোজা আর সর্দ্দার ছু'জনেই তখন উঠে দাঁড়িয়েছে—ছু'জনেরই দেহ ক্ষত-বিক্ষত।

রঞ্জিত আর কারামোজাকে লরীতে ওঠবার জন্যে ডাকতে গিয়েই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে আমার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। দেখি—সর্দ্দার রঞ্জিতের মাথা লক্ষ্য করে একটা বর্শা তুলেছে।

কি যে করব কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। ব্রেকটা নামিয়ে টিপে ধরে বন্দুকটা হাতে তুলে নিলুম। গুলি আমাকে ছুড়তেই হবে; তাতে সর্দ্দারকে না লেগে রঞ্জিতকে লাগলেও নাচার। এ দেখে আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারব না।

কিন্তু গুলি ছুড়ব কি—উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সর্দ্দার—দেখি, বর্শাটা ছোড়বার জন্যে পেছন দিকে হেলে পড়েছে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা মূর্ত্তি বেরিয়ে এল—কারামোজার। পর মুহূর্ত্তে সর্দ্দার মুখ থুবড়ে পড়ে গেল—একটা বর্শা তার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

এতক্ষণে যেন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। আনন্দে চীৎকার করে উঠলুম, বাহবা, কারামোজা, চমৎকার! দৌড়ে লরীতে উঠে পড়।

এইবার রঞ্জিত পেছন ফিরে চাইল। চকিতে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিল। সর্দ্দারের আকস্মিক পতনে নান্দিদের বিহ্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে সে ছাড়ল না। কারামোজাকে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি লরীতে উঠে এল।

—পালালো—পালালো, ধর—ধর—ভন টর্টের চীৎকার কাণে এল।

চারদিক থেকে নান্দিরা প্রায় আমাদের ঘিরে ফেললে। কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে লরী দিলুম চালিয়ে। লরীর গতিরোধ করবার জন্যে সামনে একদল নান্দি সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে দেখি, পিয়েট। রাগে তার মুখখানা বীভৎস আকার ধারণ করেছে—হাতে উদ্যত বন্দুক।

চীৎকার করে বললুম, সরে যা উল্লুক, নয়ত মরবি। পূর্ণবেগে লরী চলল। পিয়েট সরে গেল, না চাকার তলায় পিষে গেল, বুঝতে পারলুম না। ঠিক এই সময়ে সর্দ্দারের কুটীর ধূ-ধূ করে জ্বলে উঠল।

গ্রামের বাইরে যাবার ফটকটা দেখি, স্তূপাকার কাঁটা-ঝোপ দিয়ে বন্ধ। পেছনে জনতা তখন ক্ষেপে গিয়ে লরীর উপর অবিশ্রান্ত প্রস্তর বৃষ্টি করছে···দু' চারটা গুলি ও বর্শা এসে গাড়ীটার গায়ে বিঁধল, টের পেলুম। মনে হ'ল, এত কাণ্ডের

পর শেষে ধরা পড়ব ? চোখ কাণ বুজে লরী দিলুম চালিয়ে —কাঁটা ঝোপ ভেঙ্গে দিয়ে। কোন বিপদই ঘটল না— পাহাড়ের ঢালু পথে লরী গড়িয়ে চলল।

উৎসাহ ভরে আমার পিঠে এক চাপড় মেরে রঞ্জিত বললে, বাহবা, সুজিৎ, বেশ! ওরা আর বোধ হয় আমাদের অনুসরণ করবে না। সর্দ্দারের কুঁড়ের আগুন আগে ওদের নেভাতে হবে—নইলে সারা গ্রামের রক্ষে নেই।

পাহাড় থেকে রাস্তার উপর নেমে বললুম, রঞ্জিত, এখন আমরা কোথায় যাব ?

দূরে একটা তেকোণা পাহাড় দেখিয়ে রঞ্জিত বললে, আজ রাতের মত আমরা ওখানেই বিশ্রাম করব। যদি আমাদের বন্ধুরা আসেন, তাহলে আর যাতে ফিরে যেতে না হয়—সেই ব্যবস্থাই করব।

অবশেষে আমরা পাহাড়ের উপর এলুম। চাঁদের আলোয় ঘাসে ঢাকা জমি—মখমলের কার্পেটের মত দেখাচ্ছিল। দেখে মনটা খুসীতে ভরে উঠল।

সকলেই কম বেশী আহত হয়েছিলুম—তাই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শোবার বন্দোবস্ত করলুম। কারামোজা গুলো মাঠে ঘাসের ওপর। আমি স্থান করে নিলুম মধ্যে।

রঞ্জিত প্রথম রাত্রে পাহারার ভার নিলে। তিনজনে

পালা করে রাত্রি জাগব স্থির হয়েছিল। নাম্দি বা ওলন্দাজরা যে কোন সময়ে হয়ত আক্রমণ করতে পারে।

শুয়ে শুয়ে নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে চেয়ে যাত্রার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথাই ভাবছিলুম। মাঝে মাঝে চিতার ডাক, হাতীর চীৎকার কাণে আসছিল। ভাবছিলুম, কোন্‌টা ভাল? গৃহকোণের নিরুদ্বেগ শান্তিময় সুখনিদ্রা, না প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা—গভীর অরণ্যে হিংস্র জন্তুদের মাঝে মুক্ত আকাশতলে নিদ্রা……

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। রঞ্জিতের ডাকে চেয়ে দেখি, ভোরের আলো আমার সারা দেহ ছেয়ে গেছে—যেন প্রকৃতির স্নিগ্ধ-সহাস দৃষ্টি।

= ছয় =

শাপে বর

রঞ্জিতের ডাকে চোখ মেলে দেখি, সকাল হয়ে গেছে। গতরাত্রের কথা মনে হোল। রেগে বললুম, কই, কাল রাত্রে পাহারা দেবার জন্যে ত তুমি আমাকে ডেকে দাওনি রঞ্জিত!

রঞ্জিত বললে, কাল রাত্রে দেখি, তুই খুব ঘুমোচ্ছিস, তাই তোকে ডাকতে মায়া হোল। কারামোজা আর আমি পালা করে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলুম।

রঞ্জিতের কথা শুনে রাগ আরও বেড়ে গেল। বললুম, আমি কি কচি খোকা যে, তোমাদের মায়া দেখানোতে খুসী হয়ে উঠব? বাইরে যখন বেরিয়েছি, তখন সকলে সমান ভাবে কাজের ভার নিতে চাই।

রঞ্জিত হেসে বললে, বেশ, ভবিষ্যতে তাই হবে।

সকালের স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস শরীরে যেন মায়ের স্নেহ-কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিলে। ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়ে বললুম, এখন কোথায় যাবে রঞ্জিত?

রঞ্জিত বললে, ইন্দ্র ব্যানার্জ্জির দোকানে। এখান থেকে

পেট্রল আর যা যা দরকার—সব নিয়ে হাতীর দাঁতের সন্ধানে যাত্রা করা যাবে।

ইন্দ্র ব্যানার্জ্জির দোকানে যখন পৌঁছলুম, তখন সূর্য্য মাথার ওপর। দোকান থেকে টিনে করা খাবার, তাঁবু, পেট্রল আর দরকারী সমস্ত জিনিষ নিয়ে অজানার উদ্দেশে আমাদের যাত্রা সুরু হোল। এই সমস্ত জিনিষ কিনতে আমাদের দুজনের যে সামান্য পুঁজি ছিল, তাও খরচ হয়ে গেল।

রঞ্জিত বললে, তোমার পিশাচ-দানার হ্রদ কোন্ দিকে কারামোজা? এদিকে রাস্তার নাম থাকে না জানো তো?

স্তূপাকার জিনিষপত্রের উপর কারামোজা বসেছিল। রঞ্জিতের প্রশ্নে বর্শা দিয়ে উত্তর দিকে দেখিয়ে বললে, ঐ দিকে, বাওয়ানা। পথের ঠিক খবর আমি জানি না, কিন্তু ঐ দিকে লাম্বোয়া সর্দ্দারের গ্রাম; সেখানে গেলে আমরা বরফের দেশের খোঁজ পেতে পারব।

তারপর ঘন ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদী পার হ'য়ে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। কিন্তু সারাদিন ছোটার পরও সামান্য একটা পায়ে-চলা পথ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না।

মাঝে মাঝে অবিশ্বাসের মেঘ মনের মাঝে দেখা দেয়; জোর করে তা উড়িয়ে দিয়ে নতুন উৎসাহে আবার চালাতে সুরু করি।

মাঝে একবার খাওয়া দাওয়ার জন্যে ছাড়া সারাদিনের মধ্যে মুহূর্ত্তের তরেও গাড়ী থামাইনি। দেহ ক্লান্ত, ধূলি-ধূসর হলেও অজানার উদ্দেশে চলেছি ত চলেইছি।

হঠাৎ উরুতে একটা প্রচণ্ড চাপড় মেরে রঞ্জিত চীৎকার করে উঠল, পেয়েছি—পেয়েছি।

আচমকা কাণের কাছে ভীষণ শব্দ হওয়াতে আমার হাত কেঁপে ষ্টিয়ারিংটা ঘুরে গেল। গাড়ী গড়িয়ে পাশেই একটা খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে থামালুম। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললুম, সময় নেই, অসময় নেই, শুধু শুধু কাণের কাছে বিকট চীৎকার কোরো না রঞ্জিত। গাড়ী এখনই খাদে পড়েছিল। কি, পেয়েছ কি?

রঞ্জিত আমার রাগ গায়ে না মেখে বললে, গাড়ী থামিয়ে শোন—ওলন্দাজ দু'টোকে ধরবার একটা চমৎকার মতলব ঠাওরেছি। ওরা ঘোড়ায় চড়ে নান্দিদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের সন্ধানে আসতে পারে। নান্দিরা ভীষণ দৌড়োতে পারে, কাজেই ঘোড়ার সঙ্গে আসতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না। আমার বিশ্বাস, নান্দি-সর্দ্দারের মত সে লাম্বোয়া সর্দ্দারকেও ঘুস দিয়ে দলে টানতে পারবে না।

রঞ্জিতের কথায় আমি উৎসাহ বোধ করলুম; প্রশ্ন করলুম, কেন?

—কারণ এটা দু' চার পয়সার কাজ নয়। আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যে নান্দি-সর্দ্দারকে ওদের মোটা

রকমই কিছু কবলাতে হয়েছিল। তাছাড়া সকলেই ত কিছু আর নান্দি-সর্দ্দার নয়। যাক্, আমার মতলব হচ্ছে যে, ওলন্দাজদের দেখাতে হবে, রাস্তার মাঝে আমাদের লরীটা বিগড়ে গেছে। এই ভাঙ্গা পুরাণো লরীর পক্ষে সেটা যে কোন সময়েই সম্ভব। তুই আর কারামোজা কাছেই লুকিয়ে থাকবি। ওলন্দাজ দু'টো দূর থেকে কেবল আমাকে গাড়ী সারাতে দেখতে পাবে। তারপর দু'টোকে যা নাকানি-চোবানি খাওয়াব! শত্রুদের ভাবী দুর্দ্দশার ছবি মনে মনে কল্পনা করে সে হেসে উঠল।

রঞ্জিতের কথায় প্রথমটা আমি যথেষ্ট আনন্দিত হয়ে উঠলেও সে আনন্দ বেশীক্ষণ রইল না। একটু ভেবে বললুম, কিন্তু দূর থেকে যদি সে তোকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে?

রঞ্জিত লহমার জন্যে কি একটু ভেবে নিয়ে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে, তা'তেও সংকল্প তার একটুও নড় চড় হবে না।

হঠাৎ বনের মধ্যে থেকে একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ভেসে এল। কারণটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। ক্রমেই সেটা স্পষ্ট-তর হয়ে উঠল এবং সেই সঙ্গে শোনা গেল, দুম্ দুম্ শব্দ আর তীক্ষ্ণ-তীব্র আর্ত্তনাদ—যেন বিশ পঞ্চাশটা ইঞ্জিন একসঙ্গে গর্জ্জাচ্ছে।

চীৎকার করে বললুম, আশ্চর্য্য! ব্যাপার কি?

রঞ্জিত কিছু বললে না--বন্দুকটা হাতে নিয়ে বনের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরক্ষণেই একটা রোগা, বুড়ো আফ্রিকাবাসী বনের মধ্যে থেকে আতঙ্কে চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে এল। পরণের ছেঁড়া কম্বলটা তার হাওয়ায় শূন্যে উড়ছে; মাথার চুল-গুলো উঠেছে খাড়া হয়ে। মুখে চোখে মূর্ত্তিমান্ শঙ্কার ছবি। আমাদের লরীটা দেখে, সে এই দিকেই আসতে লাগল। পর মুহূর্ত্তেই বনের মধ্যে থেকে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার বেরিয়ে এল--নীচু মাথায় সোজা লোকটাকে তাড়া করে। তা' দেখে হাত পা আমার আড়ষ্ট হয়ে গেল।

কাঁধের ওপর বন্দুকটা তুলে নিয়ে রঞ্জিত চীৎকার করে বলে উঠল, সরে দাঁড়াও--পাশ ফিরে ছোট।

কিন্তু ভয়ে বুড়োটার বোধ হয় মাথার ঠিক ছিল না। সে সোজা লরীর দিকে গণ্ডারটাকে আড়াল করে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসতে লাগল।

গণ্ডারটা তখন অনেকটা কাছে এসে গেছে। হতাশ ভাবে বন্দুকটা নামিয়ে রঞ্জিত বললে, এ দৈত্যটাকে এখন ঠেকাতে পারে--জগতে এমন কিছুই নেই।

রঞ্জিতের কথাটা সত্যি বলে মনে হোল। গণ্ডারটা একটা উল্কার মত তীরবেগে ছুটে আস্‌ছে। আর লহমা মাত্র! তার পরই--লাম্বোয়াটার বাঁচার আশা দুরাশা!

রঞ্জিত কিন্তু হাল ছাড়লে না; বললে, গাড়ীটা চট্ করে

ওদিকে চালাত স্থজিৎ, যাতে আমি পাশ থেকে গণ্ডারটাকে দেখতে পাই।

বিদ্যুৎ-বেগে গাড়ী চালিয়ে দিয়ে আমি একপাশে চলে এলুম। লাম্বোয়াটাও সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে করতে আমাদের লরীর দিকে এঁকে বেঁকে ছুটে আসতে লাগল।

গণ্ডারটা কিন্তু গতি বদলাল না। নিক্ষিপ্ত তীরের মত পূর্ব্ব পথ ধরে সোজা চলে গেল।

তাকে চলে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

লোকটা লরীর পাশে আসা মাত্র রঞ্জিত দুই দৃঢ় বাহু দিয়ে তাকে গাড়ীর ওপর তুলে নিয়ে বললে, গুলি চালিয়ে আর কোন লাভ নেই। দৃষ্টি-সীমার বাইরে না যাওয়া পর্য্যন্ত গণ্ডারটা আর থামবে না।

লরীর ওপর উঠে লাম্বোয়াটার ধন্যবাদ দেওয়ার ঘটা পড়ে গেল।

কোন রকমে তার মুখ বন্ধ করে ফিরে তাকাতেই দেখি, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে গণ্ডারটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরই শূকরের মত একটা ডাক দিয়ে লরীর দিকে দৌড়ে আস্তে লাগল। বন্দুক হাতে নিয়ে রঞ্জিত বললে, লরীটা ঘুরিয়ে নিলে চল্ স্থজিৎ।

কিন্তু এত সহজে উদ্ধার লাভ বোধ করি ভগবানের অভিপ্রেত নয়!

গণ্ডারটা যে পথ ধরে উল্কাবেগে ছুটে আসছিল, ঠিক তারই সামনে এক লুকানো গর্ত্তের মধ্যে পড়ে লরীর সামনের চাকা দু'টো আটকে গেল।

হতাশ ভাবে বললুম, লরী আর চলবে না রঞ্জিত, গর্ত্তের মধ্যে আটকে পড়েছে। রঞ্জিত কোন কথা বললে না, শুধু বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিলে। চেয়ে দেখি, গণ্ডারটা আর মাত্র গজ ত্রিশেক দূরে। ক্রোধভরে শিং উঁচিয়ে সে এমন ভঙ্গীতে ছুটে আসছে যে, মনে হয় সামনে একটা হাতী পড়লে বুঝি বা তারও নিস্তার নেই।

বনস্থল কাঁপিয়ে রঞ্জিতের দোনলা বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল। এত ক্ষিপ্র হস্তে সে উপর্য্যুপরি দু'টো গুলি ছুড়ল যে, শুনলে মনে হয় যেন একসঙ্গে ছোড়া হয়েছে। লক্ষ্য নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়নি; কেন না পরক্ষণেই দেখি, বিকটাকার দৈত্যটা শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে সেইখানেই লুটিয়ে পড়েছে! তার পড়ার চাপে মাতা ধরিত্রী থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলেন বলে মনে হোল। বাবার কাছে পড়েছি, মহাভারতের ঘটোৎকচ কর্ণের বাণে ঠিক যেন এইভাবেই কুরুকুল চেপে পড়েছিল।

এক স্বস্তির শ্বাস ফেলে সবেমাত্র কপালের ঘামটা মুছচি, এই সময় দেখি, আহত জন্তুটা উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্তের মত লরী-টার পানে ছুটে আস্‌ছে। চকিতের মত এত আকস্মিক তার সে আক্রমণ যে, রঞ্জিত দ্বিতীয়বার গুলি ছোড়বার অবসর পেলে না।

"গেল" "গেল" ব'লে চীৎকার করে উঠলুম। সঙ্গে

সঙ্গে যেন একটা বিপ্লব বেঁধে গেল। লরীটা তার প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে হুড় মুড় করে উল্টে পড়ল।

আমাদের যে কি হল তা বলতে পারব না। জ্ঞান হলে উঠে বসে দেখলুম, বন্দুক হাতে রঞ্জিত তখনও মাটির ওপর পড়ে, কারামোজা ত চিৎপটাং। কতকগুলো বাক্স গেছে ভেঙ্গে, হাঁড়ি কুড়ি ইত্যাদি সব ছড়িয়ে ছত্রাকার। লরীর মাঝখানটা তুবড়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। আর তারই পাশে পাহাড়ের মত পড়ে—সেই প্রকাণ্ড গণ্ডারের মৃত-দেহটা।

হাতীর দাঁতের অভিযানে আমাদের সর্ব্বস্ব খরচ করেছি। তারই সূচনায় লরীটির এই তুরবস্থা দেখে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

রঞ্জিত উঠে বসে সমস্ত ব্যাপারটা দেখে নিলে। বললে, তুবড়ে যাওয়া ছাড়া লরীটার আর কোনও ক্ষতি হয়নি দেখছি। তারপর অল্প হেসে বললে, আমরা মিছামিছি গাড়ী ভেঙ্গে গেছে দেখিয়ে ভন টর্ট আর পিয়েটকে ধরবার মতলব করেছিলুম। আফ্রিকার জঙ্গলের মহিমা আমাদের হয়ে সত্যি সত্যিই সেই কাজ করে দিলে। অদ্ভুত এই জঙ্গল সুজিৎ, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের সামনে নতুন নতুন বিস্ময় মেলে ধরছে।

যে লাম্বোয়াটাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমাদের এই তুরবস্থা, সে তখনও মাটির ওপর পড়ে হাঁফাচ্ছিল। কারামোজা উঠে তার কাছে গিয়ে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, হতভাগা, শুয়োর কোথাকার! তোরই জন্যে আমার বাওয়ানার এই ক্ষতি হোল।

প্রথমেই তুই যদি কথা মত সরে যেতিস্, বাওয়ানা গণ্ডারটাকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারত। এটা কি তুই ইচ্ছে করে করেছিস্? সেই ওলন্দাজ হায়না তু'টোর সঙ্গে নিশ্চয়ই তোর সড় আছে। তোকে আজ আমি···

রাগে তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। দেহটা স্ফীত হ'য়ে উঠল। বৃদ্ধ লাম্বোয়ার বুক লক্ষ্য করে সে তার বর্শাটা তুললে।

রঞ্জিত খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেলে বললে, কি করছ, কারামোজা?

—ও বিশ্বাসঘাতক, বাওয়ানা।

—না, না, ভয়ে ওর মাথার ঠিক ছিল না। ওর দোষ নেই। তারপর আমার দিকে ফিরে রঞ্জিত বললে, চল্, সুজিৎ, গাড়ীটা একবার ভাল করে দেখি।

অল্পক্ষণ পরে কারামোজা লাম্বোয়াটাকে সঙ্গে করে আমাদের কাছে নিয়ে এসে বললে, এ লাম্বোয়া গ্রামের প্রধান ওঝা। বলছে, আমাদের উদ্দেশ্য নাকি এ জানে আর তাতে সাহায্যও করতে পারে; কিন্তু বাওয়ানা, আমি এদের বিশ্বাস করি না, এই ওঝাগুলো সব চোর আর বিশ্বাসঘাতক।

লোকটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখি, গলায় তার হাড়ের মালা, মাথার চুলগুলো চার পাঁচটা ঝুঁটি করে বাঁধা। কোমরে একটা বুনো জন্তুর ছাল।

রঞ্জিত জিজ্ঞেস করলে, ভূতের ওঝা?

লাম্বোয়াটা এবার কথা কইলে, ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, বাওয়ানা।

চোখ দুটো তার অদ্ভুত জ্বলজ্বলে !

—লোকে আমাকে করঙ্গো বলে ডাকে। আমি জানি, তোমরা দু'ভাই ওয়াবনিদের হাতীর দাঁতের খোঁজে চলেছ। তোমরা খুব ভাল লোক, তাই তোমাদের আমি সাহায্য করতে চাই।

রঞ্জিতের মুখ দেখে মনে হোল, লোকটার শক্তি সম্বন্ধে ওর একটুও বিশ্বাস হয়নি।

লোকটা ব'লে চলল, আমার জন্যেই তোমার আগুন-গাড়ী ভেঙ্গেছে—আমি সে সম্বন্ধেও তোমাকে সাহায্য করতে চাই, বাওয়ানা।

রঞ্জিত এবার হেসে উঠে বললে, কি সাহায্য তুমি করতে পার ?

করঙ্গো বললে, লাম্বোয়া গ্রাম থেকে একশো লোক এনে আগুন-গাড়ীটা গ্রামে নিয়ে যাব। সেখানে আপনারা নিশ্চিন্তে বসে আগুন-গাড়ী সারাতে পারবেন, তা'ছাড়া লাম্বোয়ারা লোহার কাজ ভাল জানে, তারাও আপনাদের সাহায্য করতে পারবে।

তোবড়ানো লরীটা একবার দেখে নিয়ে রঞ্জিত বললে, একশো লোক ? বেশ, আমাদের তা দরকার হবে।

অনুতপ্ত স্বরে করঙ্গো বললে, আমি তবে যাচ্ছি, বাওয়ানা। সন্ধ্যার মুখেই ফিরব। আমার দোষেই আপনা-

দের ক্ষতি হোল। সাধ্যমত আমি সে ক্ষতি পূরণ করব। কথা শেষে সে লাফাতে লাফাতে চলল এবং এক সময় দূর বন-রেখার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কারামোজা তার গমন-পথের দিকে চেয়েছিল; এখন বললে, ওকে যেতে দিয়ে ভাল করলেন না, বাওয়ানা। কে জানে, লাম্বোয়াদের নিয়ে ও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে কি না? বিশেষতঃ আমাদের আগুন-গাড়ী যখন ভেঙ্গে পড়ে আছে।

রঞ্জিত রাগত ভাবে বললে, আমার তা মনে হয় না, কারামোজা। তোমার মাথার মধ্যে বোধ হয় বিশ্বাসঘাতকতা বাসা বেঁধেছে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, যাক্, আমরা যা করতে চাইছিলুম, তা ভাল ভাবেই হয়েছে। এই মরা গণ্ডার আর ভাঙ্গা লরী দেখে ওলন্দাজ দু'টোর কোন সন্দেহই হবে না। তুই আর কারামোজা ঐ ঝোপটার মধ্যে বসে থাকগে যা।

ধীরে ধীরে আমরা ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করলুম।

সাত

নিমন্ত্রণ-পত্র

দুর্ঘটনার দৃশ্যটা রঞ্জিত চমৎকার ভাবেই সাজিয়েছিল, কিন্তু বৃথাই। ইঞ্জিনের বনেট খুলে মিছেই সে সারাদিন ধরে পরীক্ষা করবার ভাণ করলে; আর মিছেই আমি আর কারামোজা ঝোপের মধ্যে চোখ কাণ সজাগ রেখে মশা তাড়ালুম। যাদের জন্যে এত কৌশল, তাদের টিকি পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

লাম্বোয়া পাহাড়ের পিছনে তর্ তর্ করে সূর্য্য গেল নেমে। ধীরে ধীরে পৃথিবী কাল পর্দ্দায় ঢাকা পড়ল। আকাশে দু' একটা ছোট ছোট তারা ফুটে উঠল। দূরে কোন এক জলা থেকে ব্যাঙের অবিশ্রান্ত ডাক আর মাঝে মাঝে হায়নার চীৎকার ভেসে আসতে লাগল। কিন্তু শত্রু কোথায়? রঞ্জিত আমাদের গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে বলে চিন্তিত স্বরে বললে, কি আশ্চর্য্য! ভন টর্টের দেখা নেই কেন? অন্ততঃ কারামোজাকে ধরবার আশাতেও আমাদের অনুসরণ করা তার উচিত ছিল।

জঙ্গলে তখন জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। চারদিক

থেকে ভেসে আসছিল বিচিত্র কোলাহল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললুম, তাদের মতলবখানা কি বল দিকি?

—শয়তানের মনের খবর কে জানে বল্?—রঞ্জিত বললে।

বললুম, করঙ্গোরই বা কি খবর? সেও ত এখন এল না।

রঞ্জিতকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে কারামোজা বলে উঠল, বলেছিলুম, বাওয়ানা, সে বিশ্বাসঘাতক। তারপর হাতের বর্শাটা উঁচু করে ধরে বললে, এবার যদি একবার তার দেখা পাই…

কথা তার অসমাপ্তই রয়ে গেল। এই সময় পাহাড়ের ওপরের জঙ্গল থেকে চীৎকার শোনা গেল। তারপর দেখা গেল—পাহাড়ের ওপর থেকে পঙ্গপালের মত লাম্বোয়ার দল যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে নীচে নামছে। হাতে তাদের লাঠি আর বড় বড় বর্শা। অর্দ্ধ-উলঙ্গ বন্যগুলো দেখি লাফাতে লাফাতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

তাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে কারামোজা চীৎকার করে উঠল, বিশ্বাসঘাতক! করঙ্গো বিশ্বাসঘাতক, বাওয়ানা! কথা শেষে বর্শাটা ছোড়বার জন্যে সে তুলে ধরল।

কথাটা শুনে আমার দেহে যেন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। মনে হোল, এইবারে সব শেষ। কে যেন আমার গলাটা টিপে ধরে নিঃশ্বাস রোধ করে দিচ্ছে। বন্দুকের ঘোড়ায় কম্পিত আঙ্গুল রেখে রঞ্জিতের দিকে তাকালুম—যদি সে ছুড়তে বলে। দেখি, রঞ্জিত হাসতে হাসতে কারামোজাকে

দূরে ঠেলে দিলে, তারপর আমার দিকে চোখ পড়াতে বললে, না, সুজিৎ, গুলি ছোড়বার কোন দরকার নেই। গরীব বেচারারা গণ্ডারের মাংসের লোভে ছুটে আসছে।

বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে দেখলুম, রঞ্জিতের কথাই সত্যি হোল। আমাদের সামনে এসে লাম্বোয়াগুলো দু'ভাগ হয়ে দাঁড়াল। তারপর সম্মান দেখাবার জন্যে হাতের অস্ত্রগুলো তুলে ধরলে। যে চীৎকার আমরা যুদ্ধের গান বলে ভুল করেছিলুম, তা ওদের আনন্দের অভিব্যক্তি। তারপরেই তারা মৃত গণ্ডারটার কাছে উপস্থিত হয়ে বর্শা আর কুড়ুল দিয়ে, তার দেহ থেকে মাংস কেটে কেটে জমা করতে লাগল। জনকতক আবার সেইখানেই বসে পড়ে আগুন জ্বেলে মাংস ঝলসাতে সুরু করে দিলে।

রঞ্জিতকে ডেকে বললুম, এদের দিয়ে আমাদের অনেক উপকার হবে কিন্তু।

রঞ্জিত আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে লাম্বোয়াদের দিকে এগিয়ে গেল। করঙ্গোকে বললে, তোমার লোকগুলো কি হায়না, করঙ্গো? তোমার কথামত আমাদের লরী এখনি গ্রামে নিয়ে চল। মাংস এখন থাক্, পরে নিয়ে যাবে।

একটা গম্ভীর উচ্চ কণ্ঠ শুনলুম, তাই হবে, বাওয়ানা। পরক্ষণেই দেখি, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে লাম্বোয়াগুলো আনন্দে চীৎকার করতে করতে লরীর দিকে ছুটেছে।

কাঁচা চামড়ার দড়ি দিয়ে লরীটা বাঁধা হলে, করঙ্গো চীৎকার করতে লাগল—টান, টান সব; বাওয়ানার গাড়ী—বাওয়ানা আমাকে গণ্ডারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কথার সঙ্গে সঙ্গে তার মোটা লাঠিটা এর ওর ঘাড়ের ওপর ধপাধপ্ পড়তে লাগল।

করঙ্গোর হাতে লাঠি খেয়ে চীৎকার করতে করতে লাম্বোয়াগুলো গ্রামে এসে পৌঁছল। খুসী হয়ে বললুম, এবার ওলন্দাজ দু'টোর জারিজুরি আর চল্‌ছে না, কি বলিস্ রঞ্জিত ?

গম্ভীরভাবে রঞ্জিত উত্তর দিলে, সে সম্বন্ধে আমি এখনও স্থির করে কিছু বলতে পারি না।

বললুম, আচ্ছা, এখন কি হবে বলতে পারিস্ ?

—এখন আমাদের সম্মানের জন্যে একটা যুদ্ধের নাচ হবে। কাজেই আমাদের সেটা বসে দেখতে হবে, রঞ্জিত বললে। অবশ্য এর পরে লরী সারাবার জন্যে ওরা আমাদের সাহায্য করবে।

কথাটা আমার কেমন বিশ্বাস হোল না। বললুম, ওরা আমাদের লরী সারাতে সাহায্য করবে ? ওরা জানে কি ?

—লাম্বোয়ারা লোহার কাজে খুব ওস্তাদ—তা ছাড়া ওলন্দাজগুলো আসছে কিনা লক্ষ্য রাখবার জন্যে ওরা চতুর্দিকে চর রেখে দেবে বলেছে। করঙ্গো ত বলেছে যে, সে হাতীর দাঁতের সন্ধানে যাবার প্রথম চিহ্ন তুহিন-শীতল হিমের

দেশের পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে। এগুলোতে কম সাহায্য হবে না ত?

আমি বললুম, যাই হোক, এতদিনে আমরা কতকগুলো প্রকৃত বন্ধু পেয়েছি।

রঞ্জিত বললে, হ্যাঁ, আর তা' পেয়েছি শুধু সেই গণ্ডারটার জন্যে—এ কথাটা সব সময়ে মনে রাখিস্।

রঞ্জিতের কথার ধরণ শুনে হেসে ফেললুম।

এতক্ষণে গণ্ডারের মাংস নিয়ে আসা হয়েছে, লরীটাও এক জায়গায় ভাল করে রাখা হয়েছে। হাতের কাজ শেষে তারা নাচের আয়োজনে ব্যস্ত। রঞ্জিতের পাশে একটা টুলের ওপর বসে আবছা অন্ধকারে তাদের আয়োজন দেখছি। কারামোজো আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে। অদূরে মৌচাকের মত ছোট ছোট গোল কুঁড়েগুলো—মাথাগুলো ক্রমশঃ সরু হয়ে যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। ঘরগুলোর মধ্যে থেকে পায়ে চলার খস-খসানি শব্দ, উত্তেজিত চাপা গলার কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসছে।

রঞ্জিতের বাঁ-পাশে বসেছিল লাম্বোয়া-সর্দার। দেহ তার সুগঠিত। পরণে চিতার ছাল; হাতে পেতলের অলঙ্কার। মাথার টুপিতে জেব্রার বালামচি লাগান—চারদিকে ঝালরের মত ঝুলছে।

রঞ্জিত মৃদু স্বরে বললে, যা কিছু ঘটুক না কেন, কিছুতেই চঞ্চল হোস্‌নি—সুজিৎ। মনের ভাব মুখে প্রকাশ হতে দিবিনি।

রঞ্জিতের কথার মানে ঠিকমত বোধগম্য হোল না। কিন্তু আর ভাল করে জানবার সময়ও ছিল না—নাচ আরম্ভ হয়ে গেল।

যুদ্ধের ঢাক বেজে উঠল। দেখি, লম্বা চওড়া এক লাম্বোয়া প্রায় চার ফুট উঁচু ঢাকটা দু'হাত দিয়ে পিটছে। এই হোল আফ্রিকাবাসীর যুদ্ধের আদিম বাজনা। এরই আওয়াজ বন্যদের দেহে উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। আরও অনেকগুলো ঢাক এর সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠে সমস্ত বনভূমি মুখরিত করে ক্রমে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল।

এইবার বিকট চীৎকার করতে করতে প্রায় জন পঞ্চাশেক যোদ্ধা আমাদের সামনে খোলা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। মাথায় তাদের সর্দ্দারের মত টুপি, হাতে বর্শা আর ছ'ফুট লম্বা ঢাল।

আমাদের অভিবাদন করে তারা এক সারিতে দাঁড়াল। তারপর চকচকে বর্শাগুলো মাটীতে ঠুকে ঠুকে ঢাকের তালে তালে গান গাইতে লাগল। গানের মর্ম্ম হোল—নিছক আমাদের স্তুতিবাদ; তাদের সর্দ্দারকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আমরা নাকি অদ্ভুত একটা কিছু করেছি। গাইতে গাইতে তারা একবার এগোতে—একবার পেছোতে লাগল।

কিন্তু শীগ্‌গিরই ঢাকগুলো আরও দ্রুত, আরও জোরে বেজে উঠল—যুদ্ধের ধারাও গেল বদলে। এবারে তারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করতে লাগল। বাজনার তালে

তালে নাচতে নাচতে বোধ করি তারা সত্যিকার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ; যেন শোণিত-পিপাসায় হিংস্র পশু।

হঠাৎ যোদ্ধারা দৌড়ে এসে আমাদের বুক লক্ষ্য করে বর্শাগুলো যেন নিক্ষেপ করতে চাইলে। রঞ্জিতের উপদেশ মত মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। কি জানি, রক্তলোলুপ পশুগুলো যদি সত্যি সত্যিই বর্শা বুকে বসিয়ে দেয়!

ছেলেবেলায় শুনেছি, মারার চেয়ে ধমকানো ভাল ; আমাদের অবস্থাও তাই। বর্শাগুলো সত্যিই তারা বুকে বসায় না বটে, কিন্তু থেকে থেকে তেড়ে আসে আর বুকের ভেতর হৃদ্‌পিণ্ডটা ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে কোন রকমে স্থির হয়ে বসে রইলুম।

ঘণ্টা দু' তিন এই রকম ভাবে কেটে গেলে রঞ্জিত উঠে দাঁড়াল। তারপর সর্দ্দারকে অভিবাদন করে বললে, আয় সুজিৎ, আমরা যাই। ওদের উৎসব আজ সারা রাত্রি ধরে চলবে। তারপর আমার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললে, তুই যে রকম সাহস দেখিয়েছিস্, বাস্তবিক তাতে আমি খুব খুসী হয়েছি।

রঞ্জিতের কথা শুনে শুধু একটু হাসলুম। মনের প্রকৃত অবস্থাটা বলতে সত্যিই লজ্জা করতে লাগল।

পরদিন লাম্বোয়াদের সাহায্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম করবার পর লরী আমাদের ঠিক হয়ে গেল।

উৎফুল্ল কণ্ঠে রঞ্জিত বললে, অসভ্যদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে কোন কষ্টই নেই। লাম্বোয়াদের সাহায্য...

তার কথায় বাধা পড়ল। করঙ্গো এই সময় দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির।

রঞ্জিত বললে, কি করঙ্গো, ওলন্দাজরা আসছে?

হাঁপাতে হাঁপাতে করঙ্গো বললে, না, বাওয়ানা, ছ'জন পুলিশ।

পুলিশের কথা শুনে রঞ্জিত ভ্রূ কোঁচকালে। বললে, আসতে দাও করঙ্গো, বোধ হয় তারা গরু-চোরের সন্ধানে বেরিয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্দুকধারী ছ'জন পুলিশের সঙ্গে এক সার্জ্জেণ্ট এসে হাজির হোল। পুলিশ ক'জনকে থামতে বলে সার্জ্জেণ্টটি আমাদের সামনে এসে অভিবাদন করে একখানা চিঠি এগিয়ে ধরলে।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে রঞ্জিতের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

বললুম, কি খবর, রঞ্জিত?

চিঠিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পড়লুম; রঞ্জিতকে উদ্দেশ করে লেখা।

মহাশয়,

আপনার নামে অভিযোগ যে, আপনি বল পূর্ব্বক নান্দিদের গ্রামে অনধিকার প্রবেশ করিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়াছেন।

ফলে দুই জন নাম্দি হত ও বহু আহত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আপনি ভন টর্ট নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাসাই ভৃত্য কারামোজাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। অতএব এতদ্দারা আপনাকে আদেশ করা যায় যে, পত্র পাওয়া মাত্র আমার প্রেরিত লোকদের সহিত আমার নিকট সশরীরে হাজির হইয়া অভিযোগের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবেন।

'কমিশনার'

পড়াশেষে পত্রখানা হাতে করে নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম।

=আট=

যমে মানুষে মুখোমুখি

কিছুক্ষণ বাদে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললুম, এর মানে ?

গম্ভীর ভাবে রঞ্জিত বললে, ভন টর্টের চালবাজি।

চকিতের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে সরল হয়ে গেল। আমাদের অনুসরণ না করে ভন টর্ট কমিশনারের কাছে আমাদের নামে, নান্দিদের গ্রামে অনধিকার প্রবেশ ও অত্যাচারের নালিশ করেছে আর কারামোজাকে হস্তগত করবার মতলবে তার সই জাল করে এক মিথ্যা খত তৈরী করেছে। বললুম, আমরা কিন্তু যাচ্ছি না এদের সঙ্গে।

রঞ্জিত পুলিশগুলোকে দেখিয়ে বললে, কিন্তু এদের হাত এড়াবে কি করে ?

বললুম, যাওয়া মানেই ত আবার ভন টর্টের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়া।

রঞ্জিত বললে, হ্যাঁ।

বুঝলুম, হতভাগা ভন টর্ট আর একবার আমাদের ওপর চাল চেলেছে। [illegible] লাম্বোয়ারা নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে —ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করছে। অসহিষ্ণু ভাবে বললুম,

কিন্তু বিনা বাধায় সত্যি সত্যিই ত আমরা এদের কাছে কাপুরুষের মত ধরা দিতে পারি না।

রঞ্জিত কোন উত্তর দিলে না। দূরে দণ্ডায়মান পুলিশ-বাহিনী আর সার্জ্জেণ্টের দিকে একবার তাকালে। তারা স্থির, নিষ্কম্পভাবে দাঁড়িয়েছিল; মুখে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছবি—প্রাণ থাকতে কর্ত্তব্যপালন তারা করবেই।

রঞ্জিত ধীরে ধীরে বললে, দু'টোকে দুই ঘুসিতে এখুনি আমি কাবু করতে পারি—একটা মুখের কথায় লাম্বোয়ারা এখনি তিনটেকে বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলবে। কিন্তু তাতে উপস্থিত মত রক্ষে পেলেও বিপদ বাড়বে বই কমবে না। তা ছাড়া এর ফলে লাম্বোয়া-সর্দ্দারও বিপদে পড়বে।

রঞ্জিতের যুক্তির কোন উত্তর নেই। চেয়ে দেখি, পুলিশ-গুলো ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে।

ধীরে ধীরে সূর্য্য বনের আড়ালে অস্ত যাচ্ছিল। সমস্ত লাম্বোয়া গ্রামটা ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির মতই থম্ থম্ করছে। কুঁড়ের দরজায় দরজায় লাম্বোয়ারা দাঁড়িয়ে। হাতের বর্শা-গুলো তাদের অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত আলোয় ঝক্ ঝক্ করছে।

লাঠির উপর ভর দিয়ে বুড়ো করঙ্গো বিস্মিত ভাবে রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার আগুন-গাড়ী তৈরী, বাওয়ানা! জিনিষ-পত্রও সব তোলা হয়ে গেছে। আমাদের যাওয়ার আর তবে দেরী কিসের? এই লোকগুলো কি আমাদের যাওয়ায় বাধা দিচ্ছে? বলুন,

বাওয়ানা, বলুন ! আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমার এই লোকেরা আমি যা বলব, তাই করবে।

রঞ্জিত বোধ হয় এই ভয়ই করছিল, তাই তাড়াতাড়ি করঙ্গোকে পেছন দিকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, আমরা এদের সঙ্গেই যাব সুজিৎ, অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে আমরা এদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

রঞ্জিতের কথা শুনে চমকে উঠলুম ; বললুম, কি বাজে বকছো রঞ্জিত ? এদের সঙ্গে কমিশনারের কাছে যাব ?

নিরীহ ভাবে রঞ্জিত বললে, আমি এদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলেছি, সুজিৎ। কতদূর পর্য্যন্ত তা'ত বলিনি।

বুঝলুম, রঞ্জিত কিছু একটা মতলব ঠাওরেছে। বললুম, অর্থাৎ তুমি ওদের ফাঁদে ফেলতে চাও, কেমন ?

মৃদু হাসতে হাসতে রঞ্জিত বলতে লাগল, ঠিক তাই। আফ্রিকাবাসীরা পুলিশই হোক আর বুনোই হোক, মাংস পেলে আর কিছুই চায় না। আজ রাস্তায়, এক জায়গায় তাঁবু ফেলে, পুলিশ আর সার্জ্জেণ্টকে পেট ভরে মাংস খাওয়াব। পেটটা তাজা হ'লে মাথাটা হবে বোদা, তখন ওদের বেঁধে ফেলা সহজ হবে। সঙ্গে একজন লাম্বোয়াকে নিয়ে যাব। আমরা অনেকটা পথ চলে গেলে, সে ওদের বাঁধন খুলে দেবে।

রঞ্জিতের মতলব শুনে খুব হাসি পেল, কিন্তু পাছে ওরা সন্দেহ করে—তাই হাসতে পারলুম না।

রঞ্জিত সার্জ্জেন্টের সামনে এগিয়ে গিয়ে, মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বললে, আমরা তোমার সঙ্গে যেতে রাজী, সার্জ্জেন্ট —তোমার লোকদের আমার গাড়ীতে উঠতে বল—আমরা তোমাদের নিয়ে যাব।

সার্জ্জেন্ট রঞ্জিতকে চিনত। কোনরকম গোলমাল না করে আমরা যে যেতে রাজী হলুম, এতে সে স্বস্তির শ্বাস নিয়ে বাঁচল। আনন্দিত হয়ে তক্ষণি সে পুলিশগুলোকে লরীতে উঠতে আদেশ করলে।

আমরা সকলে গিয়ে লরীতে উঠলুম। করঙ্গো আমাদের সঙ্গে ওঠাতেও সার্জ্জেন্ট কোন আপত্তি করলে না।

আমাদের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে লাম্বোয়ারা কিছুদূর পর্য্যন্ত এল। বিদায়ের পূর্ব্বে তারা অনুরোধ করতে লাগল, যেন আমরা শীগ্‌গির ফিরে তাদের জন্যে আর কিছু শিকার করে দি।

রঞ্জিত হাসিমুখে তাদের শান্ত করে বিদায় করলে। তার-পর আমার দিকে ফিরে বললে, ঘণ্টাখানেক চলবার পর ইঞ্জিন একটু বিগড়ে যাবে, মনে রাখিস্। তা'হলেই বাধ্য হয়ে আমাদের তাঁবু ফেলে রাত কাটাতে হবে।

আর ওদের জন্যে কিছু শিকারও করতে হবে—আমি

রঞ্জিত বললে, ইচ্ছে ত' তাই। বোড়া সাপগুলো যেমন পেট ভরে খেলে নড়তে চড়তে পারে না—আফ্রিকার লোক-

গুলোরও ঠিক সেই অবস্থা হয়। বন্ধুদের নিয়ে বেশীক্ষণ কষ্ট পেতে হবে বলে মনে হয় না।

'হেড লাইট' জ্বেলে গাড়ী ছুটিয়ে দিলুম। সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির আনন্দে উল্লসিত। পুলিশগুলো দেখি, আনন্দে খুনসুটি করছে। বনের মধ্যে বিচিত্র কলরব। রঞ্জিত বন্দুকটা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে—শিকারের আশায়।

যে গণ্ডারটাকে রঞ্জিত মেরেছিল—তার স্তূপাকার হাড়গুলো পেরিয়ে কিছুদূর আসবার পরই রঞ্জিত গাড়ী থামাতে ইঙ্গিত করলে।

আমি প্রস্তুতই ছিলুম। সুইচ বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট ঘর্ ঘর্ আওয়াজ করে গাড়ী থেমে গেল।

সার্জ্জেণ্ট চীৎকার করে উঠল, কি হোল, বাওয়ানা? কল কি খারাপ হয়ে গেল?

রঞ্জিত চিন্তিত মুখে বললে, আমার ত' তাই সন্দেহ হচ্ছে। তারপর ইঞ্জিন খুলে কতকগুলো বাজে পরীক্ষা করে বলে উঠল, আজ দেখছি আমাদের এখানেই তাঁবু ফেলে থাকতে হবে, সার্জ্জেণ্ট। গাড়ী ত বিনা মেরামতে পাদমেকং ন গচ্ছতি। আর থাকতে যখন হচ্ছেই, তখন আমার ইচ্ছে, খাসা দেখে একটা মোষ মেরে কাল তোমাদের সম্মানের জন্যে জমকালো একটা ভোজ দি।

এতবড় সম্মান পেলে কে না খুসী হয়? খুব গম্ভীরভাবে গোঁফে তা দিতে দিতে সার্জ্জেণ্ট বললে, বেশ!

পুলিশগুলো উৎসাহভরে তাঁবু খাটাতে লেগে গেল। লরী থেকে বাক্সপত্র নামিয়ে দেখতে দেখতে দু'টো তাঁবু খাটান হয়ে গেল। আগুনের জন্যে শুকনো ডালপালাও যোগাড় করা হোল। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা লরীতে কারামোজা আর করঙ্গোর কাছে গিয়ে আমাদের মতলবের কথা খুলে বললুম। করঙ্গো ত এদের বাঁধন খুলে দেবার জন্যে তক্ষুণি রাজী হোল।

একজন পুলিশ আগুন ঠিক রাখা আর পাহারা দেবার জন্যে জেগে রইল। আমরা তাঁবুর মধ্যে শুতে এলুম। মশা আর উত্তেজনার জন্যে মোটেই ঘুম আস্‌ছে না। রঞ্জিত কিন্তু ঘুমে অচেতন। বিরক্ত হয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালুম। প্রহরী পুলিশটা দেখি, আগুনে কাঠ দিচ্ছে। হঠাৎ নিস্তব্ধ বনটা একটা গুম্ গুম্ শব্দে ভরে গেল। পুলিশটার দিকে চেয়ে বললুম, কিসের আওয়াজ বলত ?

আওয়াজটা তখন আরও জোরে হচ্ছে···

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, তারই দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, ও দেবতাদের ব্যাপার !

বুঝলুম, অসভ্যগুলো পুলিশের পোষাক পরলেও সংস্কার ছাড়তে পারে না। যা ওদের সহজ বুদ্ধির অগম্য, তাই দেবতার ব্যাপার বলে সিদ্ধান্ত করে নেয়।

আওয়াজ মেঘ-গর্জ্জনের মত শোনালেও—মেঘগর্জ্জন যে নয়—তা বুঝতে পারলুম। দেখি, একটা প্রকাণ্ড কালো স্তূপ

আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে ; যেন সচল ছোটখাটো পাহাড় একটা। ভয়ে বুকের মধ্যে দুপ্ দুপ্ করতে লাগল। দ্বিতীয়-বার তাকাতেই সংশয় সত্যে পরিণত হল। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলুম, একদল হাতী। তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে রঞ্জিতকে জাগাতে যাব, দেখি, বন্দুক হাতে সে বেরিয়ে আসছে।

মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সকলে জেগে উঠল। রঞ্জিত এক-বার দলটার দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, তাড়াতাড়ি সকলে লরীতে গিয়ে ওঠ। ওরা তাঁবুগুলো ভেঙ্গে তচ্‌নচ্ করবার জন্যে পাগলের মত ছুটে আসছে।

কেনিয়া পাহাড়ে এক জাতের হাতী আছে, যারা মানুষ দেখলে বা তাদের গন্ধ পেলে রাগে অন্ধ হয়ে যায়। বাতাসে বোধ হয় আমাদের গন্ধ তারা পেয়েছিল, তাই আগুন লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

রঞ্জিতের তাড়ায় তাড়াতাড়ি লরীতে গিয়ে উঠলুম, কিন্তু সার্জ্জেন্ট বাধা দিলে। তার বোধ হয় ভয় হোল যে, এই সুযোগে আমরা পালাব। বন্দুকটা উঁচিয়ে সে বললে, তা' হবে না, বাওয়ানা, আমরা বনের মধ্যে গিয়ে গাছে চড়ে থাকব।

—আর আমাদের লরীটা হাতীর দল ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যাবে, তাই দেখব ? রাগে রঞ্জিতের সমস্ত দেহটা কেঁপে উঠল।

সার্জ্জেন্ট সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, সে কি, গাড়ীটা ত খারাপ হয়ে গেছে।

রঞ্জিত তখন ক্ষেপে গেছে। বললে, মূর্খ কোথাকার! ডাক তোমার লোকদের।

সার্জ্জেণ্টকে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, কি, ডাকবে না? আচ্ছা!

দেখি, রঞ্জিত সেই বলিষ্ঠ সার্জ্জেণ্টকে পাঁজাকোলা করে লরীর ওপর ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর পুলিশগুলোকে আদেশ করলে ওঠবার জন্যে। জোর করে তাদের ওপরওয়ালাকে লরীতে তুলতে দেখে, তারা উলটো বুঝলে; ভাবলে, তাদের কোন রকমে ফাঁদে ফেলতে চাই; তাই লক্ষ্যহীন ভাবে তারা আমাদের গুলি করতে লাগল।

হতাশভাবে রঞ্জিত বললে, লোকগুলোর দিন ফুরিয়ে এসেছে। কই সুজিৎ, এখনও তোর ষ্টার্ট দেওয়া হোল না?

সত্যিই, গাড়ী কিছুতেই ষ্টার্ট নিচ্ছিল না। রঞ্জিতের কথায় প্রাণপণ শক্তিতে একবার চেষ্টা করলুম—চেষ্টা সফল হোল।

রঞ্জিত পিঠ চাপড়ে বললে, বেশ, এবার তীরের মত ছোটা ত দেখি।

রঞ্জিতের কথামত হাতীর পালের দিকে গাড়ী ছুটিয়ে দিলুম। সার্জ্জেণ্ট ছাড়া আর কোন পুলিশকে বাঁচাতে পারলুম না। দু'টো দেখি, গাছে চড়েছে। তাদের কি অবস্থা হবে বুঝতে বাকী নেই। যদিও আমি সকল সময় এদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার কামনা করেছি, তবুও—এরকম ভাবে নয়।

যতই এগোচ্ছি ততই দেখছি, হাতী; যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল হাতী…। প্রতিহিংসাবশে ক্রোধে অন্ধ হয়ে তারা পাগলের মত ছুটে আসছে। সমস্ত দেহে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। সৌভাগ্যের বিষয়, দলের সামনের দিকটা এক সারিতে ছিল না। ডান দিকটা বাঁ দিকের চেয়ে বেশী এগিয়েছিল। পেছন ফিরে দেখি, ডান দিকটা ততক্ষণে তাঁবুর কাছে পেঁাছেচে। —কাজেই বাকী সকলে আমাদের লরীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁবু লক্ষ্য করে ছুটল।

সেইখানেই গাড়ী থামিয়ে হাতীর দলটির ধ্বংসলীলা দেখতে লাগলুম। পা দিয়ে মাড়িয়ে, শুঁড়ে ক'রে আছড়ে, তারা সামনে যা কিছু পাচ্ছে চূরমার করে দিচ্ছে। এক একটা ধাক্কায় বড় বড় গাছগুলো মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ছে।

পাঁচ মিনিট—মাত্র পাঁচ মিনিট পাগলা হাতীর দল দাপাদাপি করলে, তারপর পায়ের ভরে পৃথিবী কাঁপিয়ে চলে গেল।

তাদের পায়ের শব্দ দূর হতে দূরে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনভূমি আবার শান্ত, স্থিরভাব ধারণ করল—ঝড়ের দাপাদাপির পর প্রকৃতির মত।

রঞ্জিতের কথায় চমক ভাঙ্গল। ধীরে ধীরে সে বললে, আফ্রিকার জঙ্গলের বিস্ময় আবার আমাদের সম্মুখীন হয়েছে। বৃথা সময় নষ্ট কোর না, চল দেখি, ওখানে কিছু পাই কি না —সমস্তই ত ফেলে আসতে হয়েছিল।

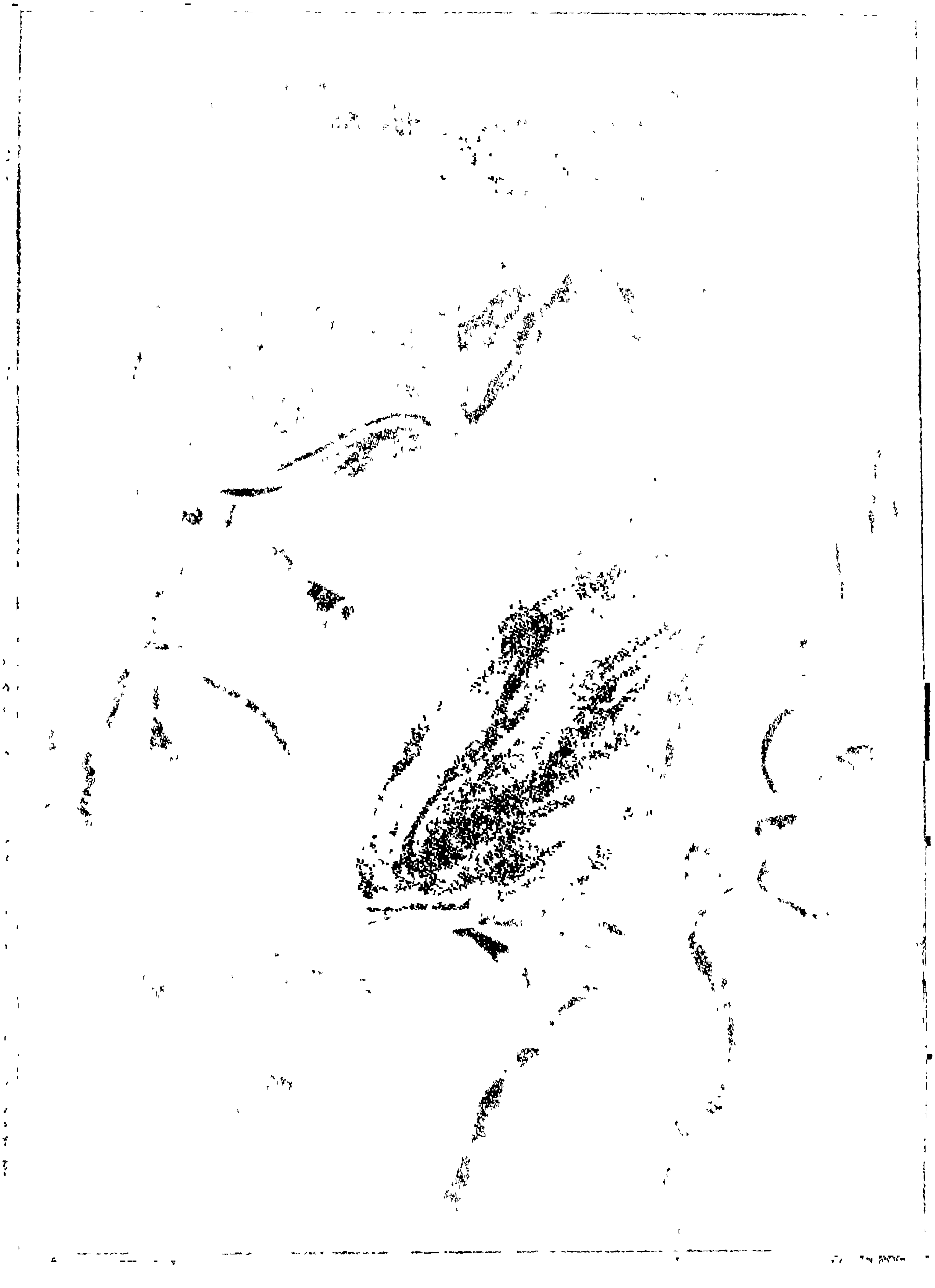

প্রতিহিংসাবশে ক্রোধে অন্ধ হয়ে হাতীগুলো পাগলের মত ছুটে আসছে।—পৃঃ ৬৬

যেখানে তাঁবু ছিল, লরী নিয়ে সেখানে এলুম। অবস্থা দেখে, ক্ষোভে—দুঃখে কান্না এল। কিন্তু নিরুপায়! লরীর প্রায় অর্দ্ধেক জিনিষ নামানো হয়েছিল, সে সমস্তই ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গিয়েছে।

রঞ্জিত বললে, অর্দ্ধেক জিনিষ নষ্ট হয়েছে, সুজিৎ, তবুও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সমস্ত জিনিষ আমরা নামাই নি।

বললুম, এর জন্যে দায়ী কিন্তু সেই ওলন্দাজ দু'টো—তাদের হাতে পেলে এর প্রতিশোধ নোবই।

রঞ্জিত বললে, এটা না ঘটুক, অন্য একটা বিপদ ঘটতই। তারপর সার্জ্জেন্টকে বললে, হাতীর দল যখন তাড়া করেছিল, তখন আমাদের পালাবার মতলব যে মোটেই ছিল না, তা দেখলে ত?

সার্জ্জেণ্ট লজ্জিত ভাবে বললে, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

রঞ্জিত বললে, তোমাদের সকলকেই বাঁচাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু পালাবার মতলব সত্যি আমাদের ছিল; শোন, ওলন্দাজ দু'টো কমিশনার সাহেবকে যা কিছু বুঝিয়েছে, সব মিথ্যে।

সার্জ্জেণ্ট যেন বিব্রত হ'য়ে পড়ল। মনে হোল, সে আমাদের কথাটা বিশ্বাস করেছে। বললে, কিন্তু বাওয়ানা…

রঞ্জিত বনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, তোমার পুলিশদের খুঁজে নিয়ে যা ঘটেছে, কমিশনার সাহেবকে সব বল।

তবে আরও তদন্ত করবার জন্যে তিনি যেন ওলন্দাজ দু'টোকে…

রঞ্জিতের কথা শেষ হোল না। বনের মধ্যে থেকে আমাদের আশে পাশে এলোমেলো কতকগুলো বন্দুকের গুলি ছুটে এলো। রঞ্জিত বললে, তোমার মাথা মোটা অনুচরদের থামতে বল সার্জ্জেণ্ট, নইলে…

রঞ্জিতকে শেষ করতে হোল না—সার্জ্জেণ্ট চেঁচিয়ে উঠল, আমি সার্জ্জেণ্ট হেমিসি বলছি—গুলি ছোড়া বন্ধ কর।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আর একটা গুলি ছুটে এল।

নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে ফুলতে রঞ্জিত বললে, শুয়ে পড় সব—তারপর…

বনের ওপাশ থেকে কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল, নীচু করে ছোড়, পিয়েট। হতভাগাদের আজ হাতে পেয়েছি। কিন্তু দেখিস্, কারামোজাকে যেন না লাগে।

বললুম, আরে! এ যে ওলন্দাজটা! আর জন কয়েক নান্দি—রঞ্জিত বললে।

দেখতে দেখতে বন্দুকের গর্জ্জনে নিঝুম রাত আর্ত্তনাদ করে উঠল। আমরাও যথাশক্তি বন্দুকের সাহায্যে তাদের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে লাগলুম।

বুঝতে পারলুম, পথের মাঝেই কারামোজাকে সার্জ্জেণ্ট হেমিসির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে হাতীর দাঁতের সন্ধানে যাবার জন্যেই এরা লুকিয়ে এসেছিল। কিন্তু রঞ্জিত যে

কি করে ব্যবস্থা উল্টে দিতে পারে—তারা বোধ হয় সে ধারণাও করতে পারে নি।

—বন্দুক ছোড়বার সঙ্গে সঙ্গে এগুতে থাক্ সুজিৎ—রঞ্জিত বললে। হতভাগাগুলো ভেবেছে, আমরা বিপন্ন। এইবার ওদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। তারপর কারামোজা ও করঙ্গোর দিকে ফিরে বললে, বিকট চীৎকার আরম্ভ করে দাও তোমরা—যাতে ওদের ধারণা হয়, আমাদের কাছে অনেক লাম্বোয়া বন্ধু আছে।

করঙ্গো আর কারামোজা বিকট চীৎকার সুরু করে দিলে।

বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে রঞ্জিত আর আমি প্রায় কুড়ি গজ দূরে দু'টো ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলুম। সেইখানে থেকে এবার আক্রমণ করতে আমাদের খুব সুবিধা হোল।

ওলন্দাজ দু'টোর দল ক্রমশঃ হটে যাচ্ছে। আমি অগ্রসর হয়ে আর একটা ঝোপ থেকে আক্রমণ করতে লাগলুম। হঠাৎ মাথার ওপর যেন এক হাতুড়ীর ঘা পড়ল। সমস্ত মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দু'টো সবল বাহু আমার গলা টিপে ধরে ক্রমাগত পীড়ন করতে লাগল।

চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসছে···কাণেও যেন কিছু আর শুনতে পাচ্ছি না। অতি দূর···যেন কোন্ মায়ালোক থেকে কাণে ভেসে এল—এটা ছোট ভাইরে। চল্, কর্ত্তা বলেছে, একে নিয়ে গেলেও সমান কাজ হবে।

কথার শেষে তারা আমাকে ঘাসের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললো, বুঝতে পারলুম ; তারপরেই আমার চোখের সামনে নেমে এল ঘন কালো পর্দ্দা…আমি জ্ঞান হারালুম।

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল জানি না। চোখ মেলে দেখি, অপরিচিত স্থানে এক কঠিন পাথরের ওপর শুয়ে আছি। অকথ্য বেদনায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে, হাত-পায়ের বাঁধনগুলো যেন মাংস কেটে ভেতরে বসে যাচ্ছে। সে যাতনা বুঝি আর সহ্য করতে পারি না।

কাণে কথার স্বর ভেসে আসতে অতি কষ্টে পাশ ফিরে দেখি, আমার অনতিদূরে জন দশ বারো নান্দি বসে খোসগল্প করছে। যেখানে শুয়ে আছি, সেটা একটা গুহা, এক পাশের দেওয়ালে নান্দিদের বর্শাগুলো সারি সারি দাঁড় করানো।

বুঝলুম—ভন টর্টের হাতে বন্দী আমি। গুহার মুখে সে তার ছেলে পিয়েটের সঙ্গে কথা কইছে। আমার চোখ-চাওয়া —তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

পৈশাচিক হাসি হেসে আমার কাছে সে এগিয়ে এল। কোমরে তার জলহস্তীর চামড়ার চাবুকটা ঝোলান ; বললে, তাহলে তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে ?

জানতেই যখন পেরেছে তখন আর অচৈতন্য হবার ভাণ করা বৃথা। মনকে দৃঢ় করে নিয়ে বললুম, কারামোজা ব'লে ভুল করে আমাকে ধরে এনেছ দেখছি। তোমার হাতীর দাঁতের পথের সন্ধান—আমি ত বলতে পারব না।

এখন থেকে তুমিই আমাদের পথ দেখিয়ে যাবে। সেই মাসাই কুকুরটাকে আর কোন দরকার নেই।

বাঁধনের জন্যে সমস্ত শরীরে অসহ্য জ্বালা বোধ হলেও তার মুখের দিকে চেয়ে আমার শরীর হিম হয়ে এল। সে-মুখের নিষ্ঠুর ভাব দেখে মনে হোল—অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্যে সে করতে না পারে এমন কাজই নেই। তবুও মরিয়া হয়ে বললুম, পথের সন্ধান আমি জানি না।

ভন টর্টের মুখ কঠিন হয়ে উঠল; বললে, শয়তানি করতে যেও না, জান তুমি সব। অজ্ঞান অবস্থায় তুমি তুহিন-শীতল হিম-প্রদেশের কথা বলে ফেলেছ। তাই শুনে, সে পথের আদ্ধেকটা আমরা এসে পড়েছি। এর পরে কি বল?

অজ্ঞান অবস্থায় যা' বলে ফেলেছি তার আর চারা নেই। কিন্তু প্রাণ গেলেও আর একটা কথাও প্রকাশ করব না ঠিক করে বললুম, রঞ্জিত এখনই আমার সন্ধানে এসে পড়বে; কাজেই এর পরের পথের সন্ধান জেনেও তোমার বিশেষ কোন লাভ হবে না।

হো হো করে হেসে উঠে সে বললে, তোমার দাদা এতক্ষণে কমিশনারের কাছে হাজির হয়েছে। যে চারটা পুলিশ বেঁচে ছিল, আমি তাদের লেলিয়ে দিয়েছি। কাজেই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। এখন তুহিন-শীতল হিম-প্রদেশের পরে কি আছে বল?

বললুম, কারামোজাকে জিজ্ঞেস করোগে।

ভন টর্ট গম্ভীর হয়ে গেল ; বললে, কাঁচা চামড়া দিয়ে তোমার হাত পা বেঁধেছি। ক্রমশঃ চামড়া তোমার মাংস কেটে বসবে। যন্ত্রণার চোটে একটু বাদে তোমাকে সমস্ত বলতে হবেই। মিথ্যে তবে কেন তোমার যন্ত্রণাটা বাড়াচ্চ!

কোন উত্তর না দিয়ে চেয়ে রইলুম।

আমার এই নীরব অবাধ্যতা দেখে ভন টর্ট বোধ হয় আর ধৈর্য্য ধরতে পারলে না। চাবুকটা কোমর থেকে টেনে নিয়ে সপাং সপাং করে ঘা কতক গায়ে পিঠে বসিয়ে দিলে। চাবুক ত নয়—মনে হচ্ছিল, যেন করাতের দাঁত। প্রতি আঘাতে চামড়া ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। যন্ত্রণার ধমকে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে এল, তবু কোনরকমে দাঁতে দাঁত চেপে নিরুত্তরে পড়ে রইলুম।

কর্কশ কণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠল, নিয়ে আয় ঐ বর্শাটা। চেয়ে দেখি, একজন নান্দি আগুনে-পোড়া লাল টকটকে একটা বর্শা তার হাতে এনে দিলে।

বর্শাটা হাতে নিয়ে ভন টর্ট আমার ওপর ঝুঁকে পড়ল। বললে, এখনও বল্‌ বলছি—নইলে গরুর মত ছাপ দিয়ে দোব।

আমাকে নিরুত্তর দেখে, ভন টর্টে ধীরে ধীরে বর্শাটা আমার খোলা বুকের কাছে নামিয়ে আনলে। আতঙ্কে আর উত্তাপে মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে উঠল। একবার মনে হোল, এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে পথের সন্ধান দি বলে। পরক্ষণেই

মাথায় এক মতলব এল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, ধীরে ধীরে চোখ বুজে মূর্চ্ছার ভাণ করলুম।

ভন টর্ট আমার চালাকি ধরতে পারলে না। একটা নান্দিকে ডেকে বললে, বর্শাটা ফের তাতাতে দে। ওর জ্ঞান না এলে কিছু হবে না।

সহসা একটা ঝড়াং ঝড়াং শব্দ গুহার সকলকেই উৎকর্ণ করে তুলল। একজন নান্দি বলে উঠল, যদি আবার বাওয়ানা আসে, তাহ'লে আর আমরা যুদ্ধ করব না। তোমার জন্যে অনেক করেছি—অনেক লোক আমাদের প্রাণ দিয়েছে।

ভন টর্ট দৌড়ে গুহার মুখে গেল।

শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছিল। বুঝতে পারলুম, এ আমাদের লরী। মনটা আনন্দে নেচে উঠল—রঞ্জিত আসছে।

নান্দিরা চঞ্চল হয়ে উঠল। পালাবার আর সময় নেই দেখে, ভন টর্ট চীৎকার করে উঠল, ধরা আমি কোনমতেই দোব না। রাস্তার দু'ধারে—গাছে আগুন লাগিয়ে দাও।

আনন্দে চীৎকার করতে করতে বর্ব্বরগুলো দু'সারি গাছে আগুন লাগিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে বাতাসে এক গাছ থেকে আর এক গাছে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। উদ্ধারের যে ক্ষীণ আশা মনের কোণে জেগেছিল, সেটুকুও নিভে যেতে দেরী হোল না। এই সর্ব্বগ্রাসী আগুনের মাঝে লরী সমেত রঞ্জিতের নিস্তার নেই—কোন মতেই...আর ভাবতে পারলুম না। সত্যি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

জ্ঞান হলে চোখ মেলে চাইতেই দেখি, ভন টর্ট আমার পাশে বসে। আমাকে চাইতে দেখে সে বললে, আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এর পরে কোন্ পথে যাব বল ?

চীৎকার করে বললুম, তুমি গোল্লায় যাও। বাধা দেবার চেষ্টা!—আমার ভাইকে তাহ'লে আজ পর্য্যন্ত চিনতে পারনি।

পরম নিশ্চিন্তে সে বলে উঠল, তোমার ভাই!—সে এতক্ষণে আগুনে পুড়ে মরেছে। যদিও সে কোন রকমে রক্ষে পেয়ে থাকে, তবে কমিশনারের হাতে ধরা পড়েছে। এখন যা জিজ্ঞেস করছি, সুবোধ বালকটার মত তার উত্তর দাও।

আমার কাছ থেকে তুমি কখনই তা জানতে পারবে না।

পৈশাচিক হাসি হেসে ভন টর্ট বললে—কালই জান্তে পারব। তোমার হাতে পায়ে বাঁধা কাঁচা চামড়ার রগড়টা এখনও টের পাওনি—কাল যখন মাংস কেটে বস্‌তে থাক্‌বে, তখন আপনি ডেকে সব বলবে।

বনে আগুন লাগিয়ে ভন টর্ট গুহা ছেড়ে এখানে এসেছিল ; এই সময়—আমার কাছ থেকে উঠে গিয়ে সে আগুনের ধারে নাফিদের কাছে বসল।

ক্রমশঃ রাত্রি এলো। তাঁবুর সকলে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু আমার চোখেই ঘুম নেই। হাত-

পায়ের বাঁধনে কি অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। তার ওপর দুর্ভাবনা।

দূর থেকে সিংহ, হায়নার ডাক ভেসে আস্‌ছে।—কোন্ সময়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম; কিসের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা—তারই মাঝে মৃদু আওয়াজটা লক্ষ্য ক'রে তাকাতেই অনিশ্চিত আশার আনন্দে দেহে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখি প্রায় নিঃশব্দেই ধীরে—অতি ধীরে একখানা পাথর ক্রমশঃ আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

ভন টর্ট বা নান্দিদের কারও গভীর রাতে এ গোপনতার প্রয়োজন নেই, সুতরাং পাথরের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে যে প্রাণীটা এগিয়ে আস্‌ছে, সে যে আমাদের পথেরই কেউ, সেটুকু বুঝে নিতে দেরী হ'ল না, কিন্তু কে ও? তবে—তবে—রঞ্জিত নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। কারামোজা বা করঙ্গোও হতে পারে।

এই সময় পাথরের পাশ দিয়ে কম্বলের এক টুকরো দেখা গেল।

নিঃশ্বাস রোধ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। ধীরে ধীরে পাথরটা আমার পাশে এসে থামল। পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়েই আনন্দে আর একটু হলে চীৎকার করে উঠেছিলুম আর কি!

রঞ্জিত—রঞ্জিতই তা হলে অন্ধকারে কম্বল ঢাকা দিয়ে এসেছে আমাকে উদ্ধার করতে।

হাত-পায়ের বাঁধন কাটতে কাটতে রঞ্জিত চাপা গলায় গর্জ্জে উঠল, কাঁচা চামড়া দিয়ে বেঁধেছে, উল্লুক ! আচ্ছা।

বাঁধন কাটা হলে লাফিয়ে উঠতে গেলুম, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ বদ্ধ থাকার পর শরীরে সবেমাত্র রক্ত চলাচল সুরু হওয়াতে দেহ যেন অবশ হয়ে গেল। মাটীতে লুটিয়ে পড়লুম।

রঞ্জিত বললে, ভন টর্ট কোথায় ?

নীরবে আঙ্গুল দিয়ে যেখানে নান্দিদের সঙ্গে সে শুয়েছিল, দেখিয়ে দিলুম।

—ভন টর্ট আর তোকে এখনি তাঁবু থেকে নিয়ে যাচ্ছি, বলে রঞ্জিত অগ্রসর হল।

বাধা দেব কি, সমস্ত ব্যাপারটা যেন ঠিক মত বুঝতে পারছিলুম না—শুধু রঞ্জিতের চলার দিকে চেয়ে রইলুম।

হিংস্র চিতার মত রঞ্জিত ভন টর্টের উপর লাফিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই দু'জনের মধ্যে শুম্ভ নিশুম্ভের রণ বেধে গেল। অকস্মাৎ ঘুম ভাঙ্গার পর একটা ঝটাপটির শব্দ শুনে নিদ্রা-জড়িত চোখে নান্দিরা বর্শা হাতে ছুটে এল। কিন্তু তারপরেই দেখি, ভন টর্টকে তলায় ফেলে রঞ্জিত তার গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার নিকষ-কালো পিস্তল। ভন টর্টের মাথা লক্ষ্য করে সেটা ধরে সে কর্কশ কণ্ঠে বললে, যদি বাঁচতে চাস, এখনি তোর লোকদের এখান থেকে চলে যেতে বল্ আর সুড়সুড় করে তুই আমার সঙ্গে আয়।

রঞ্জিতের রুদ্রমূর্ত্তি আর বজ্রকণ্ঠ শুনে নান্দিরা আক্রমণ করা সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করতে লাগল। ভন টর্ট বললে, গুলি করতে তোর সাহসই হবে না।

রঞ্জিত গম্ভীরভাবে বললে, সাহস হবে না? আচ্ছা, দু' সেকেণ্ড বাদেই বুঝতে পারবি।

নিস্তব্ধ তাঁবুটা রঞ্জিতের গম্ভীর স্বরে গম্ গম্ করে উঠল, এখনও আমার কথা শুন্‌লি না?

ভন টর্ট হেসে বললে, মিথ্যে ভয় দেখাসনি। গুলি তুই কখনও ছুড়তে পারিস না।

গুড়ুম!—রঞ্জিতের পিস্তল থেকে একটা গুলি ভন টর্টের কাণের পাশ দিয়ে মাটীতে পুঁতে গেল। মরণভয়ে সে তখন চোখ বুজলে।

রঞ্জিত ব্যঙ্গভরে হেসে বললে, এর পরেরটা কি ঠিক কপালের মাঝখান দিয়ে চালাব?

আতঙ্কে ভন টর্ট চীৎকার করে উঠল, আর ছুড়তে হবে না, আমি ধরা দিচ্ছি। তারপর নান্দিদের দিকে চেয়ে বললে, তোরা বর্শা ফেলে দে।

রঞ্জিত তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বললে, চল।

—তুমি আমায় নিয়ে কি করবে? ভন টর্ট জিজ্ঞেস করলে।

কথা কাটা-কাটিটা তার সময় নেবার একটা ছল। এই অবসরে সে যে পালাবার সুযোগ খুঁজছে—রঞ্জিত তা বুঝতে

পেরে ভন টর্টের চাবুকটা নিয়ে তাকে সপাং সপাং করে দু'ঘা কসিয়ে দিলে। অতি কষ্টে চীৎকার করতে করতে সে উঠে দাঁড়াল। বুঝলুম, আমার উপর সে যে অত্যাচার করেছিল, রঞ্জিত তার শোধ নিলে।

কারামোজা ও করঙ্গো এসে খবর দিলে, পিয়েট এই গোলমালে সরে পড়েছে।

রঞ্জিত একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। বললে, যাক্‌গে।

আমাদের আর বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। ভন টর্ট রাগে আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নান্দিদের সেইখানে অপেক্ষা করতে বলে আমাদের সঙ্গে অগ্রসর হল।

পথে তার অত্যাচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললুম, ভন টর্ট যদি তোমার কথা না শুনত? যদি নান্দিদের আক্রমণ করতে বলত?

হেসে রঞ্জিত বললে, ভগবান্ জানেন, তাহ'লে কি হোত!

—তুমি তাকে সত্যি সত্যি গুলি করতে না?

—না, কারণ পারতুম না।

—কেন?

রঞ্জিতের মুখে হাসি খেলে গেল; বললে, তাঁবুতে ঢুকেই বুঝেছিলম, পিস্তলে মাত্র একটি গুলিই আছে। আর সেটা ত ওকে ভয় দেখাতে খরচ হয়ে গেছল।

কি রকমভাবে বোকা বনেছে শুনে, ভন টর্ট রাগে ফিরে দাঁড়াল। রঞ্জিত বন্দুকের নলটা তার বুকের ওপর তুলে ধরে

বললে, মিথ্যে মিথ্যে আমাকে তুমি জোর প্রকাশ করতে বাধ্য কোর না।

ক্রমে লরীর কাছে এসে পৌঁছলুম। ভন টর্টকে বেঁধে, রঞ্জিত তার পোষাকটা খুলে নিয়ে নিজে পরে ফেললে।

নিস্ফল ক্রোধে ভন টর্ট বলে উঠল, হাতীর দাঁত তুই কোন রকমেই পাবি না। আমি তোকে ঠিক হারিয়ে দোব, দেখিস।

কারামোজা আর করঙ্গো ভন টর্টের দু'পাশে উঠে বসলে, আমরা লরী ছেড়ে দিলুম।

রঞ্জিত বললে, কমিশনারের সঙ্গে একঠা বোঝাপড়া করতে পারলেই আমরা নির্ঝঞ্ঝাট হই।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই বলে উঠলুম, একটা কথা জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি রঞ্জিত, তুমি আমার খোঁজ পেলে কি করে?

নয়

রঞ্জিতের কথা

রঞ্জিত বলতে আরম্ভ করল, কখন যে ওরা তোকে ধরে নিয়ে গেছল, তা তুইও জানিস না—আমিও বুঝতে পারিনি। যুদ্ধ করতে করতে যখনই ফাঁক পাই, একটু করে এগিয়ে যাই। তোকেও এগিয়ে যাবার জন্যে চেঁচিয়ে বলতে থাকি। আমি সেদিন শত্রুদের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করবার জন্যে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম যে, তুই এগুচ্ছিস্ কিনা—তা দেখবার খেয়ালই ছিল না আমার। বার বার সার্জ্জেণ্ট হেমিসি নান্দিদের থামতে বলছিল—কিন্তু বৃথা। আমরা যখন শত্রুদের অনেক কাছে গিয়ে পড়েছি, সেই সময় কতকগুলো দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেলুম। সার্জ্জেণ্ট হেমিসি চীৎকার করে উঠল, ওরা পালাচ্ছে—কিন্তু পালাতে ওদের কোন রকমেই দেওয়া হবে না। আমরা সকলে তখন পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলুম।

ঠিক সেই সময়ে দু'টো গুলি ছুটে এল আমাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হেমিসি মাটির ওপর পড়ে গেল। গুলি দু'টো তার বুকে এসে বিঁধেছিল।

আমি যেন তখন পাগলের মত হয়ে গেছি। চীৎকার করে বললুম, কারামোজা, ওরা সার্জ্জেণ্টকে খুন করেছে। তার পরই ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি চালালুম। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের ভেতর থেকে একটা করুণ আর্ত্তনাদ ভেসে এল। দৌড়ে গিয়ে দেখি, দু'টো নান্দি প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। আর কাউকে পেলুম না, তবে কতকগুলো পায়ের শব্দ দূর হ'তে ক্রমে দূরান্তরে মিলিয়ে যেতে শুনে বুঝতে পারলুম, এই দুটো নান্দিকে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রেখে ভন টর্ট বাকী সকলের সঙ্গে পালিয়েছে।

অনুসরণ করা বৃথা। তাই সার্জ্জেণ্টের কাছে ফিরে এলুম। দেখি, মাটির ওপর সে লম্বা হয়ে পড়ে। গুলি তার ফুস্‌ফুস্‌ ভেদ করে গিয়েছিল।

যুদ্ধ থেমে গেল, অথচ তুই আসছিস না দেখে, বুকের মধ্যে দুর্ দুর্ করে উঠল। চীৎকার করে ডাকলুম, সুজিৎ—সুজিৎ, কিন্তু কোন উত্তর পেলুম না। ভাবলুম, তবে কি হেমিসির মত তুইও···বুকের সমস্ত রক্ত যেন এই চিন্তাতে জমে গেল।

কারামোজা আর করঙ্গোকে নিয়ে সমস্ত জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম, কিন্তু কোন সন্ধান পেলুম না। হাতীর দল যে রকম ভাবে মাটি দাপাদাপি করে চষে গিয়েছে, তাতে কোন চিহ্ন পাওয়ার আশা দুরাশা।

কারামোজা ও করঙ্গোকে ডেকে বললুম, সুজিতকে না

পাওয়া পর্য্যন্ত ওলন্দাজ বা হাতীর সন্ধানে কারুরই যাওয়া হবে না। আগে তোমরা আমার ভাইকে খুঁজে বের কর।

তিনজনেই তিন দিকে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। কারা-মোজা বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, বাওয়ানা, আমরা এখনই তাঁকে খুঁজে বার করব।

হঠাৎ কারামোজার চীৎকারে আমি দৌড়ে তার কাছে গেলুম। দেখি, সে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বললুম, কোন সন্ধান পেলে কারামোজা!

সামনের মাড়ান ঘাসগুলো হাতের বর্শাটা দিয়ে দেখিয়ে কারামোজা বললে, ছোট বাওয়ানাকে বন্দী করেছে।

হয়ত কারামোজার কথাই সত্যি, তবু বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। মাটির ওপর কতকগুলো খালি পায়ের দাগ। কারামোজা ততক্ষণে সেই দাগ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেছে। এক জায়গায় হঠাৎ থেমে প'ড়ে সে ব'লে উঠল, এইখান থেকে তাকে কাঁধে বা পিঠে করে নেওয়া হয়েছে।

আমি বললুম, কিন্তু কোন রক্তের দাগ ত' নেই!

কারামোজা বললে, না। দাগ দেখে মনে হচ্ছে, বাওয়ানাকে পেছন থেকে লাঠি মেরে অজ্ঞান করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে— নইলে ধস্তাধস্তির দাগ পাওয়া যেত।

রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। মনে মনে স্থির করলুম, যদি তোর ওপর কোন রকম অত্যাচার করে থাকে, তবে এমন কঠিন প্রতিশোধ নোব তার যে, ভন টর্ট জীবনে

ভুলতে পারবে না। তখনি কারামোজা আর করঙ্গোকে লরীতে উঠতে আদেশ করলুম।

ঠিক সেই সময় চারটি মূর্ত্তি আমাদের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছে দেখতে পেলুম। কতকটা কাছে এলে বুঝতে পারলুম, তারা পুলিশ ; রক্ত আমার গরম হয়ে উঠল। সামনে আসতেই চীৎকার করে উঠলুম, সরে দাঁড়া সব।

তাদের মধ্যে একজন বললে, আমাদের সর্দ্দার কই ?

বললুম, মরে গেছে।

সে বলে উঠল, তুমিই তাকে মেরেছ, বাওয়ানা।

বললুম, তোরা গুলির শব্দ শুনতে পাস নি ?

সে বললে, হাতীর তাড়া খেয়ে যদিও আমরা অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলুম, তবুও গুলির শব্দ শুনেছি। অনেক কষ্টে পথ চিনে ফিরে আসছি।

—আমরা কতকগুলো নান্দি আর দু'টো ওলন্দাজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলুম। তারা এই পথে পালিয়েছে—দেখিস্‌নি ?

অবিশ্বাসের হাসি হেসে সে বললে, নান্দি ! বুঝতে পেরেছি, বাওয়ানা, তুমি আমাদের পিছু পিছু লাম্বোয়াদের আসতে বলেছিলে, তারাই আক্রমণ করেছিল।

—ওলন্দাজগুলো আমার ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করতে যেতে হবে। পথ ছেড়ে দে।

—তা হবে না, বাওয়ানা, তোমাদের যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

পুলিশগুলোকে আক্রমণ করলে কমিশনার নিজে আমাকে ধরতে আসবে—তাই আমি এতক্ষণ কিছু বলিনি, কিন্তু এবার আর সহ্য হোল না। ধৈর্য্য হারিয়ে তাদের আক্রমণ করলুম। আমার দেহে তখন যেন অসুরের বল। অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিশ চারজন মাটিতে শুয়ে পড়ল—নড়বার চড়বার ক্ষমতা রইলো না তাদের।

কারামোজা বললে, এদের সকলকে শেষ করে দি বাওয়ানা! নইলে পরে আবার এরা গোলমাল বাধাতে পারে।

কারামোজাকে ধমকে লরী চালিয়ে দিলুম। কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে কোন্ পথে যাব?

ঠিক করলুম, ওলন্দাজগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল, সেইদিকে যাব। অল্পদূর যাবার পরই কারামোজা চীৎকার করে থামতে বললে। জিজ্ঞাসা করলুম, কারামোজা, কোন সন্ধান পেলে?

কারামোজা বললে, হ্যাঁ, বাওয়ানা, এইধারে একটা পায়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি।

লরী থামিয়ে তিনজনে নেমে পড়লুম। কিছুদুর যাবার পর কারামোজা একটা তোবড়ান টুপি কুড়িয়ে পেলে—বুঝলুম, সেটা তোরই টুপি।

বললুম, তুমি ঠিক ধরেছ, কারামোজা। হায়নাগুলো সুজিতকে এই পথেই নিয়ে গেছে।

করঙ্গো সন্দিগ্ধভাবে বললে, শুধু একটা খালি পায়ের দাগ রয়েছে—কই, জুতোর দাগ ত নেই ?

বললুম, বাকী সকলে বোধ হয় কাঁকরের ওপর দিয়ে চলেছে, তাই দাগ দেখতে পাচ্ছি না। একটা দাগই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আর এই পথটা দূরে ঝোপের মধ্যে গিয়েছে। তারা বেশীদূর যেতে পারেনি—দৌড়ে গিয়ে গাড়ীতে ওঠ তোমরা।

যে পথে তোর টুপি পাওয়া গিয়েছিল, তারই কিছুদূরে গণ্ডার চলার পথ। কিন্তু নিজেদের বিপদের দিকে তাকাবার সময় ছিল না তখন, তাই সেই পথেই লরী ছুটিয়ে দিলুম। আমার মনে হয়েছিল, পালাবার জন্যে ভন টর্ট এই চওড়া পথই বেছে নিয়েছে।

পথটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তার ওপর বাঁকের পরে বাঁক—ঘোরা সিঁড়ির মতন। প্রতি মুহূর্ত্তে পাশে খাদে পড়বার সম্ভাবনা থাকলেও লরীর গতি কমাইনি। দু'ধারে দৃষ্টি রেখে চলেছি—যদি আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়। হঠাৎ ঝড় ঝড় করে লরীটা গড়িয়ে গেল—ঢালু-পথে। কোন রকমে ওলটানোর হাত থেকে লরীটা রক্ষা করলুম, কিন্তু প্রাণপণে ব্রেক কষেও থামাতে পারলুম না। নীচে চেয়ে দেখি, ছোট পাহাড়ে-নদী একটা বয়ে যাচ্ছে—তারই কোলে বালির বিছানা পাতা ; দেখেই মাথা ঘুরে গেল। বললুম, শীগগির নেমে পড় সব, চোরাবালির মধ্যে গাড়ী বসে গেছে।

লরী ছেড়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম। টুপিটা ওখানে

ফেলে রেখে ভন টর্ট যে আমাদের ভুল পথে চালিত করেছে—বুঝতে আর দেরী হোল না।

বললুম, কারামোজা, শীগগির ডাল পালা কেটে লরীর চাকার কাছে ফেল। এখুনি উদ্ধারের ব্যবস্থা না করলে লরীর আশা আমাদের চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করতে হবে।

কারামোজা আর করঙ্গো তাড়াতাড়ি ডাল পালা কাটতে আরম্ভ করলে, আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিলুম।

যথেষ্ট ডাল পালা জমা হলে, আমি লরীতে গিয়ে বসলুম। তারপর পিছু হটাবার চেষ্টা করতেই মনে হল—একটু চলল, কিন্তু তক্ষুণি আবার সামনের দিকে গড়িয়ে এল আর ফলে বালিতে বসেও গেল আরো খানিকটা।

গতিক সুবিধে নয় দেখে, কারামোজা আর করঙ্গোকে দড়ি দিয়ে পেছন থেকে টানতে বললুম, কিন্তু দু'বার চেষ্টা করার পর বালিতে লরী বরং আরও পুঁতে গেল, তবু এক পাও এগুল না। ইঞ্জিন ভীষণ গরম হয়ে উঠল—ভয় হোল ফেটে যেতে পারে, তবু সেটাকে মনের মাঝে আমল দিলুম না। এক একটা মিনিট যায় আর মনে হয়, তোর উদ্ধারের এক মিনিট মিছে নষ্ট হোল। কারামোজাদের প্রাণপণে টানতে বলে আর একবার চেষ্টা করতেই ভাগ্যক্রমে লরী ভাল ছেলের মত সুড় সুড় করে উঠে এল।

কারামোজা বললে, ইঞ্জিন বড্ড তেতে গেছে, একটু ঠাণ্ডা হতে দেওয়া উচিত।

= দশ =

অগ্নি পরীক্ষা

তার কথায় যুক্তি ছিল—ছিল না শুধু আমার দেরী করার শক্তি। বললুম, কারামোজা, এবার কোন্ পথে গেলে ভন টর্টের সন্ধান পাব বল।

কারামোজা বললে, বোধ হয় তারা হিম-দেশের দিকে এগিয়েছে, বাওয়ানা।

কারামোজার কথাই সত্যি মনে হোল। কিন্তু কি করে তারা প্রকৃত পথের সন্ধান পেল, সেইটেই ঠিক করতে পারলুম না। মনে হোল, অমানুষিক অত্যাচার করে হয়ত তারা তোর কাছ থেকে পথের সন্ধান জেনে নিয়েছে। মনে হতেই, প্রতিশোধ নেবার স্পৃহায় পাগল হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারার মত উল্কাবেগে গাড়িখানা ছুটিয়ে দিলুম।

কিছুদুর এসে, বনের পথ ধরে যেতে দেখি, দূরে দু'ধারের গাছ থেকে ভীষণ ধোঁয়া উঠছে আর মশাল হাতে কতকগুলো লোক গাছে গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বললুম, কারামোজা, ভন টর্ট আগুনের ভয় দেখিয়ে আমাদের পথ বন্ধ করতে চায়।

কিন্তু এ বাধা আমি মানব না—আগুনের মধ্যে দিয়েই আমি গাড়ী চালাব।

কারামোজা আমার কথার কোন উত্তর দিলে না। শুধু তার লাঠি আর বর্শাটা হাতে করে আমার পাশে এসে বসল।

কিছুদূরে ঐ গুহার মধ্যে হয়ত তুই আছিস্, এইটুকু কোন রকমে যেতে পারলেই তোকে পাব, এই চিন্তায় আমার সব দ্বিধাসঙ্কোচ নিঃশেষে ভাসিয়ে নিল। আগুনের ভয়ে পশুপাখী-গুলো প্রাণ বাঁচাতে এ ধারে ওধারে ছুটে পালাতে লাগল—শুধু আমিই আশা নিয়ে তার দিকে ছুটলুম।

কিন্তু বৃথাই। দাবানলের মত সে অগ্নিশিখা তখন লক্‌লকে জিভ বার করে আধ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মোটা মোটা কাঁচা গাছগুলো ফাটার শব্দ ভেসে আসছে—যেন কামান দাগার আওয়াজ। ঘন ধোঁয়া ফুলে ফুলে উঠে আকাশের সূর্য্যকে পর্য্যন্ত ঢেকে ফেলবার উপক্রম করল, আর বাতাস! বাপ্ সেকি গরম! যেন চিমনীর ভেতর কেউ আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল; ভয় হচ্ছিল, আগুনের হল্‌কায় মুখগুলো আমাদের এখনই রামের অনুচরটির মত না হয়ে যায়! এ ভেদ করে যাওয়া অসম্ভব! দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললুম। না, চেষ্টা করা বৃথা! আর এক পাও এগুনো যাবে না।

কারামোজা বললে, অন্য কোন পথ নেই, বাওয়ানা?

আগুন ততক্ষণ আমাদের ঘিরে ফেলেছে—সামনে, পেছনে,

ডাইনে, বাঁয়ে যে দিকে চাই—শুধু রক্তচেলী-পরা অগ্নিশ্রী নৃত্য করছে। ভাঙ্গা লরী আমাদের কোন দিন ঘণ্টায় ২৫ মাইলের বেশী চলেনি; কিন্তু ৪০ মাইল বেগে ছুটিয়েও আগুনের হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। যে কোন মুহূর্ত্তে পেট্রলের টিনগুলোয় আগুন লেগে যেতে পারত।

কারামোজা বললে, আমাদের আগুনের খাঁচার মধ্যে পুরেছে, বাওয়ানা। পালাবার কোন আশাই নেই।

দূরে একটা টিলা দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলুম। বললুম, কারামোজা, ওখানে পোড়াবার কিছু নেই। যদি কোন রকমে একবার ওখানে পৌঁছতে পারি, তবে আর ভয়ের কিছু থাকবে না। জামা, কম্বল যা কিছু সব, যে জল আমাদের সঙ্গে আছে তাতে ভিজিয়ে, পেট্রলে ভাল করে চাপা দিয়ে দাও। তারপর আগুনের মধ্যে টিলা লক্ষ্য করে লরী ছুটিয়ে দিলুম।

সেই সময়টার কথা তোকে আমি বোঝাতে পারব না, সুজিৎ, তখন আমার কোন জ্ঞান ছিল না। আমি যেন পৃথিবীতে নেই—যেন কতকাল ধরে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছি...

যখন আবার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এল, দেখি টিলার ধারে পৌঁছে গেছি। বললুম, কারামোজা, এ রকম আগুন কারো কোন দিন ক্ষতি ছাড়া ভাল করবে না; তবে আমাদের পক্ষে হয়ত একটু ভালই হবে, কারণ এই আগুনের বেড়া

ডিঙ্গিয়ে আমাদের সন্ধানে কমিশনার সাহেবকে আসতে একটু বেগই পেতে হবে।

কারামোজা বললে, তখন যদি পুলিশগুলোকে সাবাড় করতে দিতেন, বাওয়ানা, তবে এখন আর ভাবনা থাকত না।

পুলিশগুলোকে মেরে আমি যে আইন মত কাজ করিনি, কারামোজাকে তা বোঝাতে পারব না, তাই বললুম, কারা-মোজা, শীগ্‌গির লরীতে ওঠ ; ভন টর্ট আর তার ছেলে এতক্ষণ হয়ত নিজেদের নিরাপদ মনে করে খুব স্ফুর্ত্তি করছে—তাদের আনন্দটা একবার দেখতে হবে।

যেখান থেকে নান্দিগুলো বনে আগুন দিয়েছিল, সেই জায়গা লক্ষ্য করে আমি লরীটাকে চালিয়ে দিলুম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর গুহাটার একান্ত কাছে এসে পড়লেও আমাদের অভ্যর্থনা করতে একটিও গুলি ছুটে এল না। যা ভয় করেছিলুম, অবশেষে তাই সত্যি হোল। দেখলুম, গুহার মধ্যে অগ্নিকুণ্ডে কেবল ছাই জড় করা—ভন টর্ট তোকে নিয়ে নান্দিদের সঙ্গে সরে পড়েছে।

এবার তারা কোন্ পথে গেছে—সহজেই সেটা খুঁজে বের করতে আর দেরী করলুম না, উল্কাবেগে চিহ্নাঙ্কিত পথে গাড়ী ছুটিয়ে দিলুম। কিন্তু সূর্য্য তখন অস্তাচলে হেলে পড়েছে ; সন্ধ্যা হবার আর দেরী নেই। যা করেই হোক, অন্ধকারের আগেই আমাকে পৌঁছতে হবে, কারণ রাত্রে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শত্রুদের শিবির খোঁজা চলবে না।

ভন টর্টের দল কতটা এগুতে পারে—মনে মনে একটা আন্দাজ করে নিলুম। আরও মাইল কয়েক যাবার পর অন্ধকার গাঢ় হোল। নীল আকাশের বুকে সোণার বরণ চাঁদ দেখা দিল।

মনে হ'ল কাছাকাছি এসে গেছি, তাই লরী থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম। পকেটে অটোমেটিক পিস্তল আর হাতে রাইফেলটা নিয়ে বললুম, কারামোজা, লরীতে আর যাওয়া চলবে না। শত্রুরা তা হলে জেনে যাবে। এইখান থেকে হেঁটে আমরা তাদের সন্ধানে যাব।

কারামোজা তার লাঠি আর বর্শাটা নিয়ে করঙ্গোকে নামতে বললে, তারপর লরীটা ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আমরা তিনজনে ভন টর্টের খোঁজে চললুম।

উঁচু-নীচু পাহাড়ের পথে আমাদের চলা হোল সুরু। নিশাচর জানোয়ারদের নানারকম গর্জ্জনে জঙ্গল তখন মুখর হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দূরে আগুন দেখতে পেয়ে মাটির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। কারামোজা আর করঙ্গোকেও শুতে বললুম। দেখি, কিছুদূরে একটা তাঁবু আর তার ধারে ধারে কতকগুলো ছায়া-মূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কারামোজা বললে, ওলন্দাজ হায়না দু'টোর তাঁবু—বাওয়ানা।

বললুম, হাঁ, কিন্তু ওর ভেতরে ঢোকবার একটা মতলব ঠিক কর। বললুম বটে, কিন্তু নিজের মাথায় কোন উপায়ই

এল না। ভেবেছিলুম, ওরা বনের মধ্যে তাঁবু ফেলবে···কিন্তু এই খোলা জায়গায় নান্দিদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটা কুকুরও ঢুকতে পারবে না।

কারামোজা বললে, গুলি ছুড়ে ওদের আক্রমণ করলে হয় না, বাওয়ানা? অত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল; বললুম, তোমার মাথা গোবর ভরা কারামোজা, সুজিতেক ওরা কার্য্য-সিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করবে। তোমার মতলব কোন কাজে আসবে না।

আমার নিজের পক্ষে নান্দিদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁবুতে ঢোকা অসম্ভব বলে মনে হোল। আর কারামোজা বা করঙ্গো কাউকেই একলা নিশ্চিত মরণের মুখে পাঠাতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কাজেই কি করা যায় ভাবতে লাগলুম। তারপর কি করেছিলুম, তা ত তুই জানিসই।

==এগার==

জয়যাত্রা

আমাকে লরীতে ষ্টার্ট দিতে ব'লে রঞ্জিত জিজ্ঞাসা করলে, এইবার আমরা কোন্ দিকে যাব, কারামোজা ?

কারামোজা বললে, ওলন্দাজদের তাঁবু ছাড়িয়ে বরফের দেশ—আগুন-গাড়ীতে আমরা কাল সকালের মধ্যে সেখানে পৌঁছতে পারব ।

—তারপর ? রঞ্জিত জিজ্ঞাসা করলে ।

কারামোজা উত্তর দিলে, তারপরে পিশাচ-দানার জলা । সেটার পথ আমি জানি না বটে, তবে করঙ্গো আমাদের নিয়ে যাবে ।

'হেড লাইট' জ্বেলে লরী ছেড়ে দিলুম । আমাদের যাত্রাপথে কত অজানা বিপদ লুকিয়ে আছে—কত লোক এই হাতীর দাঁতের খোঁজে এসে প্রাণ দিয়েছে—এসব কিছুই আমাদের উৎসাহ নষ্ট করতে পারেনি । সবচেয়ে আনন্দের কথা, ভন টর্ট আমাদের হাতে বন্দী । প্রতিপদে তার ভয়ে আর আমাদের পথ চলতে হবে না । একটু ভয়ের কারণ ছিল, শুধু কমিশনার সাহেব আর পুলিশের দল । কিন্তু ভন টর্ট যে আগুন জ্বেলে

এসেছে, তা এড়িয়ে আসতে তাদেরও যথেষ্ট দেরী আছে। ততক্ষণে আমরা তার নাগালের বাইরেও চলে যেতে পারি।

কিছুক্ষণ পরে রঞ্জিত থামতে বললে—বিশ্রামের জন্যে। খুসী হয়ে গাড়ী থামিয়ে ফেললুম, কারণ বিশ্রামের দরকার হয়ে পড়েছিল আমাদের সকলেরই। নাম মাত্র কিছু মুখে গুঁজে লম্বা হয়ে পড়া গেল। সারারাত আর জ্ঞান ছিল না; রঞ্জিতের ডাকে ঘুম যখন ভাঙ্গল—চোখ মেলে দেখি, তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, পেটটাকে যা হোক কিছু দিয়ে ভর্ত্তি করে আবার যাত্রা সুরু করলুম।

শীত করছিল ভয়ানক; তার ওপর কন্‌কনে হাওয়া লেগে হাতের আঙ্গুলগুলো যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছিল—ষ্টিয়ারিং হুইল-টাকে বুঝি আর ধরে রাখতে পারি না।

চারদিক গাঢ় কুয়াসায় ঢাকা। কয়েক হাত দূরেও পথের মাঝে কি আছে দেখবার উপায় নেই। ক্রমশঃ আমরা উঁচুতে উঠতে লাগলুম। সে ওঠার যেন আর শেষ নেই—যেন বছরের পর বছর ধরে এই রকম ভাবে উঠছি। অনেক বেলা হ'লেও কুয়াসার জন্যে সূর্য্যের মুখ দেখা ভার হলো। কোন্ পথে যে যাচ্ছি, তাও বোঝা যায় না। কেবল মাঝে মাঝে করঙ্গোর চীৎকারে বুঝতে পারছি, পথ আমাদের ভুল হয় নি।

ক্রমশঃ ওঠার কষ্ট কমে এল। ধীরে ধীরে আমরা একটা সমতল উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলুম। চারদিকে

কুয়াসার ঘন আবরণ ভেদ করে কোন কিছুই দেখতে পেলুম না।

করঙ্গো চীৎকার করে উঠল, এইটে হোল তুহিন-শীতল হিমের প্রদেশ, বাওয়ানা। এই পথেই চলতে থাকুন।

তুহিন-শীতলই বটে! শীতে শরীরের হাড় পর্য্যন্ত কেঁপে উঠছে। তবুও আমাদের প্রথম লক্ষ্য স্থানে পৌঁছেচি জেনে শরীর মন চাঙ্গা হয়ে উঠল।

বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াসা সরে গিয়ে ফুটে উঠল অপূর্ব্ব দৃশ্য—রঙ্গমঞ্চের পট পরিবর্ত্তনের মত। আনন্দে ছেলেবেলাকার গান জুড়ে দিলুম। গাড়ীর গতি কিন্তু কমাই নি। হঠাৎ...

কিচির মিচির শব্দে চেয়ে দেখি, ঘন ঘাসের মধ্যে কতকগুলো বেবুন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর যেন অদ্ভুত একটা কিছু দেখেছে—এমনিই ভাবে মাঝে মাঝে উঁকি মারছে। জোরে হর্ণের আওয়াজ করতেই ভয়ে তারা ছুট দিল—তারপর গজ পঞ্চাশেক দূরে উঁচু পাথরের আড়ালে গিয়ে রাগে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা উপত্যকার ওপর দিয়ে ছুটলুম। উট পাখীদের দ্রুত চলার অভিমান আছে; ভাঙ্গা লরী যে তাদের চেয়ে জোরে যাবে, সেটা বোধ করি তারা সহ্য করতে না পেরে, গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে লাগল। বক আর সারসগুলো মাটিতে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে ডানা মেলে আকাশে উড়ল।

চলতে চলতে শুধু যে প্রকৃতির এই সুন্দর জীবগুলোকে দেখতে পেলুম, তা নয়—দু'জায়গায় স্তূপাকার হাড়ও দেখতে পাওয়া গেল।

রঞ্জিত বললে, হাতীর দাঁত খুঁজতে এসে এদের এই পরিণাম হয়েছে।

জল, খাবার, তেল, পেট্রল সবই আমাদের সঙ্গে প্রয়োজন-মত আছে। শত্রুর ভয়ও বিশেষ কিছু নেই—শুধু একটা ভয় হচ্ছিল, বর্ষার সময় এগিয়ে এসেছে, বৃষ্টি না নামে।

যা হোক, তুহিন-শীতল দেশের শেষ হলো। খাড়া ঢালু পথে আবার আমরা নীচে নামতে লাগলুম। ঠাণ্ডার স্থান অধিকার করল গরম বাতাস।

সমতল ভূমিতে নেমে দেখি, চারধারে কেবল মিমোসা গাছ। এখানে সেখানে কতকগুলো নালা; দূরে পর্ব্বত-মালা। পর্ব্বতমালার মাঝ দিয়ে লিখে মুছে ফেলার মত অস্পষ্ট-ভাবে একটা পথ দেখা যাচ্ছে।

কারামোজা চীৎকার করে বললে, পিশাচ-দানার হ্রদ এবার কোন্ পথে যাব, করঙ্গো?

হাতের হাড়ের লাঠিটা উঁচিয়ে করঙ্গো গিরি-পথটা দেখিয়ে দিলে; বললে, ওই পথে। ঐখানেই যত দত্যি-দানা বাস করে, বাওয়ানা। তাই ওখানে গেলে আর মানুষে ফেরে না।

দৈত্য-দানা আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না। এই নির্জ্জন পরিত্যক্ত ভূমিতে বিপদের বিশেষ কোন সম্ভাবনা আছে বলেও

মনে হোল না। তা' ছাড়া দুপুরের মধ্যেই আমরা হ্রদ ছাড়িয়ে যেতে পারব বলে আশা হোল।

এক বন্দী ভন টর্ট ছাড়া আমরা সকলে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলুম—লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার আশায়।

সূর্য্যের তেজ প্রখর হবার সঙ্গে সঙ্গে ধূলোর ঝড় উঠল। গরম বালিগুলো গায়ে এসে বিঁধছিল, যেন রাশি রাশি সূচ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হচ্ছিল। স্নানের আর দরকার হলো না, প্রচুর স্বেদ-ধারাতেই সেটা শেষ করে নেওয়া গেল।

দুঃখের পর সুখ আছে—এটা নাকি মস্ত বড় তত্ত্ব-কথা; তেমনই তুহীন-শীতল হিম-প্রদেশের পর হঠাৎ এই গরমের মধ্যে পড়ে সে সত্যটা আমরা হাতে হাতেই অনুভব করলুম। সমস্ত দেশটা যেন রুক্ষ-প্রকৃতি বুড়োর মত। স্নেহ-মমতার এতটুকু ছায়া পর্য্যন্ত কোথাও নেই। যতই এগুতে লাগলুম, নজরে পড়ল, টিলার পর টিলা আর কাঁটা গাছের ঝোপ।

'এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে' আর কি!

গাছপালার মত দেশটাকে প্রথমতঃ প্রাণীশূন্য বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে জ্রেবার দলকে চলে বেড়াতে দেখলুম। দীর্ঘগ্রীবা জিরাফরা ঝোপের ওপর দিয়ে বারে বারে কৌতূহলী দৃষ্টিতে লরীর পানে উঁকি দিয়েই, চক্ষের নিমেষে আবার লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গেল বটে, কিন্তু তারা বোধ হয় কারামোজার শ্যেন-দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। সে বলে উঠল, মাংস, বাওয়ানা, মাংস!

হাসতে হাসতে রঞ্জিত ধমকে উঠল, হোক্ মাংস। লরীটা আমাদের চলতি মাংসের দোকান নয়। তুই চালা, সুজিৎ। পাহাড়ের এধারে কিছুর জন্যেই আমরা থামব না।

কিন্তু থামতে আমাদের হোলই। রঞ্জিতের কথা মিথ্যে প্রমাণ করাবার জন্যেই যেন লরীটা বালিতে বসে গেল। কোন রকমেই তা' আর নড়ান গেল না।

গাড়ী থেকে সকলে নেমে, বালি খুঁড়ে লরী উদ্ধার করলুম, কিন্তু মাইলখানেক যেতে না যেতে আবার সেই অবস্থা। এবার মালপত্র নামিয়ে তবে লরী উদ্ধার করতে হোল।

বিরক্ত হয়ে রঞ্জিত বললে, বারে বারে যদি এই রকম ভাবেই সময় নষ্ট হয়, তাহ'লে দুপুরের আগে হ্রদ পার হবার কোন আশাই নেই।

ভন টর্ট হো হো করে হেসে উঠল; বললে, কি বলেছিলুম? কমিশনার এসে পড়বে আর তোদের আমি হারাবই।

ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে রঞ্জিত বললে, তুমি যে—গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল দিতে সুরু করলে ভন টর্ট! আগে থাকতে আনন্দে অতটা লম্ফ ঝম্ফ কি বুদ্ধিমানের কাজ! কমিশনারের আসার ওপর যদি তুমি নির্ভর কর; তবে তার এখনও অনেক দেরী। তবে মনে মনে এই ভেবে যদি তুমি গোমড়া মুখের বদলে একটু খোস তবিয়তে থাক, তাতে আমাদের অবশ্য কোন আপত্তি নেই।

ভন টর্ট কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একবার মুখ ভেংচালে,

কিন্তু বারবার বিঘ্ন এসে এই রকম ভাবে দেরী হয়ে যাওয়াতে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম।

গন্তব্য-স্থানে পৌঁছবার আগে এখনও অনেক নদী-নালা পেরোতে হবে। সামনেই বর্ষা—ঢল্ যদি একবার নামে, তা'হলেই পাহাড়ে-নদী হঠাৎ বড় লোকদের মত ফুলে ফেঁপে একেবারে একশা হবে। ফেরবার পথে বর্ষা নামলে অবশ্য কোন ভাবনা নেই; কারামোজা ঘোরা পথ একটা জানে, কিন্তু যাবার পথে যদি······

চারজনে আমরা প্রাণপণে লরী উদ্ধারে লেগে গেলুম।

আকাশের দিকে চেয়ে রঞ্জিত বললে, বৃষ্টির এখন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তারপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা দূরে উপত্যক ওপর একবার বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, কমিশনার এত শীগগির আমাদের ধরতে পারবে না, কি বলিস সুজিৎ?

লরী উদ্ধার হলে আমরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলুম। আর এক লহমাও দেরী না করে যতটা সময় নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতি পূরণ করবার জন্যেই যেন উল্কাবেগে গাড়ী ছুটিয়ে দিলুম।

ক্রমে যতই পর্ব্বতমালার নিকটবর্ত্তী হতে লাগলুম, ততই গিরিপথটা আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে লাগল।

পাহাড়ের বুক-চেরা এই পথ ধরে ওপারে গেলেই পিশাচ-দানার হ্রদ। তারপরে···ভাবতেই শরীর শিউরে ওঠে! আমাদের শেষ লক্ষ্য সেই পাহাড়, যার বুকে বহুদিনের শোনা হাতীর দাঁতের গুহায়—হাতীর দাঁত আছে।

গিরি-পথের মধ্যে গাড়ী চালাতে গিয়েই হাত পা হঠাৎ থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল; চীৎকার করতে গেলুম—মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুল না।

অকস্মাৎ আমার লরী থামাবার কারণ জানবার জন্যে রঞ্জিত মাথা নীচু করে দেখতে লাগল। কারামোজা আর করঙ্গো দাঁড়িয়ে উঠল। পথের উপর ধূসর রঙের কতকগুলো জন্তু লাফা লাফি করছে।

রঞ্জিত বলে উঠল, সিংহ।

কারামোজা বললে, বাবারে! পাঁচটা ধাড়ী আর তিনটে বাচ্ছা!

তারা একটা কিছু নিয়ে খেলা করছিল, ইঞ্জিনের ঘর্ঘর শব্দ কাণে যেতেই সোজা হয়ে বসল।

যে রকম দৃপ্ত ভঙ্গীতে তারা লরীটার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে রইল, তা দেখে মনে প্রশংসা জেগে ওঠে।

রঞ্জিত সোজা হয়ে বসে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল; বললে, আমাদের কিন্তু ওদের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। সুজিৎ, ওদের একটু তাড়া দে দেখি।

রঞ্জিতের কথায় হর্ণ দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ী চালাতে লাগলুম। তাতে ফল হলো এই যে, দু'টো সিংহ গুড়ি মেরে লরীর দিকে মুখ করে বসল। অনেকটা দূরে হলেও স্পষ্টই দেখলুম, রাগে তাদের চোখগুলো জ্বলছিল, লেজগুলো চাবুকের মত সপাং সপাং করে মাটীর ওপর আছড়াচ্ছিল।

বললুম, ওরা সরবে না, রঞ্জিত।

বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে, রঞ্জিত বললে, সরতে ওদের হবেই। আমি হঠাৎ বন্দুক চালাতে চাই না, কিন্তু······

কথার মাঝে থেমে রঞ্জিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাদের দেখে নিলে, তারপরে বললে, একটা মরা জেব্রা পড়ে না? ওদের খাবার সময় আমরা বাধা দিয়েছি। হয়ত ওরা নড়বে না। তবুও আমাদের ভয় দেখাতে হবে। জোরে ওদের দিকে গাড়ী চালা।

রঞ্জিতের কথায় দাঁতে দাঁত চেপে সজোরে লরী চালিয়ে দিলুম। যে সিংহ আক্রমণ করতে প্রস্তুত, তার দিকে ছুটে যাওয়া বড় সোজা কথা নয়।

জানতুম, সিংহেরা বিশেষ ক্ষুধার্ত্ত না হলে মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু তাই বলে খাওয়ার সময় বাধা দেওয়ার পরেও সে আমাদের অনুকম্পাভরে ছেড়ে দেবে—এ বিশ্বাস আর যারই থাক, অন্ততঃ আমার ছিল না। তাছাড়া বাচ্ছাগুলো সঙ্গে থাকায় তারা আরও ক্ষেপে উঠেছে।

রঞ্জিত বললে, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। যে কোন রকমেই হোক, আমাদের এই পথে যেতেই হবে।

ঠিক এই সময়ে কারামোজার চীৎকারে পেছন ফিরে দেখি, প্রায় আধ মাইল দূরে ঝোপের মধ্যে সূর্য্যের আলোয় কতকগুলো কি চিক্ চিক্ করে উঠতেই আর বুঝতে কোন সন্দেহ রইল না যে, সেগুলো বন্দুকের নল।

রঞ্জিত সবিস্ময়ে বলে উঠল, আরে এ যে কমিশনারের দল! এত শীগগির এরা এল কি করে? সুজিৎ, উড়ে চল্—উড়ে চল্; যে করেই হোক, আমাদের আগেই পৌঁছতে হবে।

লরীর যতটা ক্ষমতা—তত জোরেই চালিয়ে দিলুম। রঞ্জিত তার বন্দুক, কারামোজা ও করঙ্গো তাদের নিজের নিজের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল।

এগুতে এগুতে দেখলুম, একটা সিংহ লাফাবার জন্যে প্রস্তুত; তিনটে সিংহী মাথা নীচু করে ছুটে আসছে। তারপর ...তারপরই লরীর শব্দ ছাপিয়ে একটা ভীষণ গর্জ্জন সমস্ত বনটা কাঁপিয়ে তুললে।

=বারো=

মারীচের অবস্থা

ভন টর্টের চীৎকারে চেয়ে দেখি, একটা সিংহী আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। বললুম, রঞ্জিত, আর রক্ষে নেই—একটা সিংহী তেড়ে আসছে।

রঞ্জিত ভারী গলায় বললে, একটা নয়—দু'টো।

দেখি, সত্যিই একটা নয় দু'টো সিংহী মাটিতে নেমে এসেছে। আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে তারা লাফ দেবার চেষ্টা করছে। রঞ্জিত ক্ষিপ্র হস্তে বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হোল—সম্মুখ-যুদ্ধে। কমিশনার যখন এত কাছে এসে পড়েছে, তখন এ ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কি সে চরম মুহূর্ত্ত—ভাবা যায় না। জেনে শুনে আমরা সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোলে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ একটা সিংহী দিলে লাফ। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিতের বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল। সিংহীটা দেখি, বার দু'য়েক ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

রঞ্জিতের বন্দুক দ্বিতীয় বার গর্জ্জন করে উঠল। তাতে দ্বিতীয়টি মরলো না, সামান্য আহত হোল মাত্র।

দু'টি প্রাণীর শোচনীয় পরাজয়ে পশুরাজের শক্তি-গর্ব্বে

বোধ হয় আঘাত লেগেছিল, তাই বাকী চারটে সিংহ সিংহী লরীটাকে ঘিরে ধরলে। আহত সিংহীটা উঠতে না পেরে পড়ে পড়ে কাতর কণ্ঠে সঙ্গীদের জানাতে লাগল, রক্ত চাই—রক্ত…

আক্রমণোদ্যত সিংহদের ভয় দেখাবার জন্যে কারামোজার বিকট চীৎকার, ভন টর্টের প্রাণভয়ে করুণ আর্ত্তনাদ আর রক্ত-পাগল সিংহদের গভীর গর্জ্জনে পৃথিবী যেন বধির হয়ে গেল। লরীটা থামিয়ে বন্দুকটা হাতে তুলে নিলুম। রঞ্জিত নতুন করে টোটা ভরে নিলে।

ভয়ে আর উত্তেজনায় নিজের অজ্ঞাতেই গুলি ছুড়ে ফেললুম। আর একটা সিংহ মাটিতে শুয়ে পড়ল। কিন্তু এতেও তারা দমল না। ক্ষিপ্তের মত দাপাদাপি করে তারা এমন ধূলোর ঝড় সৃষ্টি করল যে, কিছুই দেখবার উপায় রইল না। আমাদের এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নিতে তারা ত্রুটি করল না। মনে হোল, একটা সিংহ যেন আমাকে লক্ষ্য করে লাফ দিচ্ছে। বন্দুক ছুড়লুম বটে, কিন্তু বুঝলুম না—লাগল কি না।

কারামোজা চীৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লরীটা দুলে উঠল। সন্দেহ হোল, হয়ত সিংহটা লাফ দিয়ে লরীর ওপর উঠেছে, কিন্তু ধূলোর পর্দ্দা ভেদ করে কিছুই দেখতে পেলুম না। শুধু রঞ্জিতের চীৎকার আর বন্দুকের গর্জ্জন কাণে এল।

হঠাৎ নজরে পড়ল, ইঞ্জিনের ওপর একটা সিংহ উঠেছে। দেখে—প্রথমটা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু তখনি সামলে নিয়ে গুলি ছুড়লুম। লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নি, গুলিটা বোধ

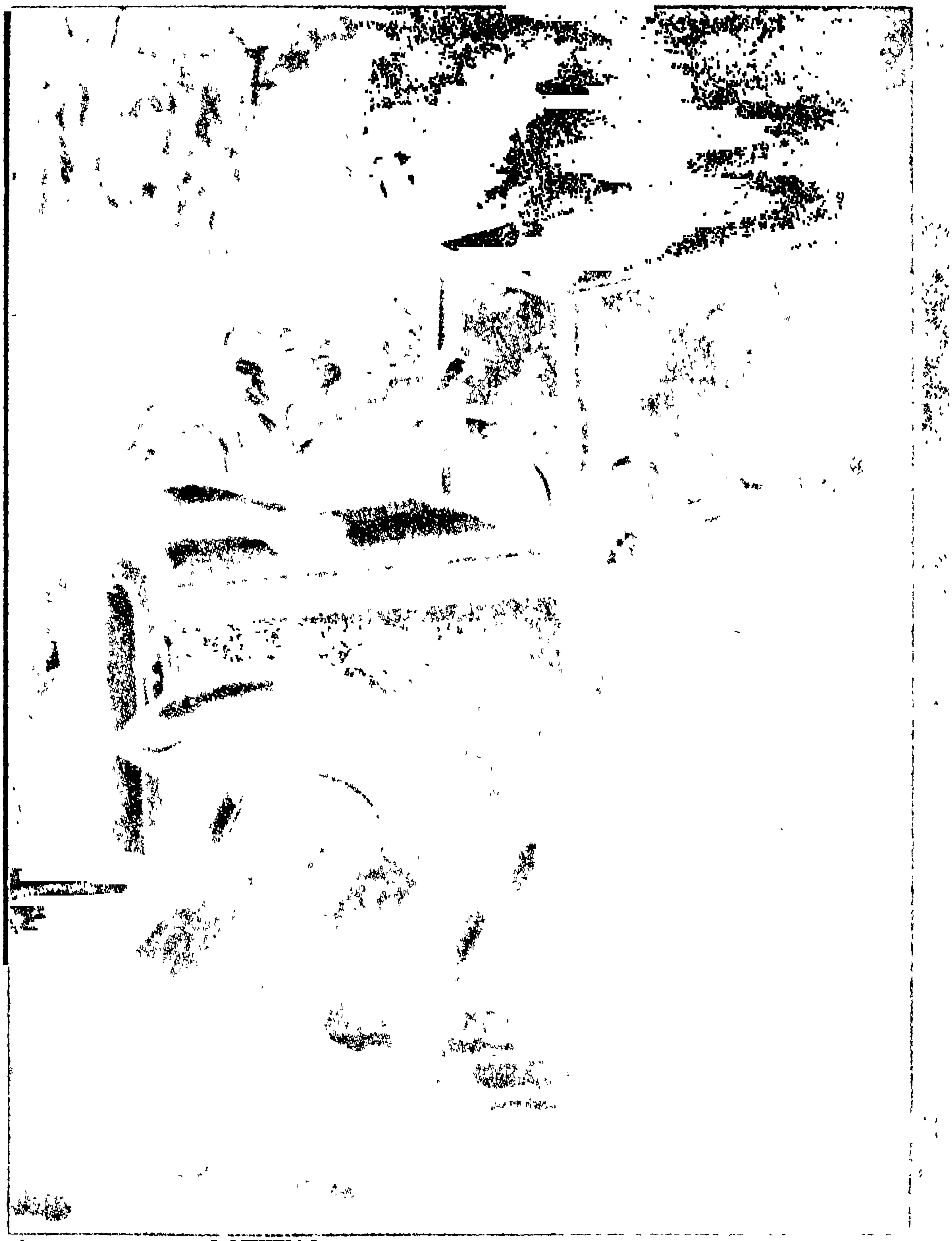

হঠাৎ নজরে পড়ল, ইঞ্জিনের ওপরে একটা সিংহ উঠেছে। পৃঃ ১০৪

হয় তার গলায় বিঁধেছিল, তাই যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

যেদিকে চাই, সেদিকেই সিংহ। মাথার ভেতর কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। রঞ্জিতের বন্দুক ছোড়ার বিরাম নেই। তার ক্ষিপ্রতা দেখে বাস্তবিকই অবাক হতে হয়, কিন্তু মনে বেশ বুঝছি, ভয় পেলে বা এতটুকু সময় নষ্ট করলে আর রক্ষে নেই।

সময় পেয়ে একটু সামলে নিয়ে পূর্ব্বের আহত সিংহটা আবার লাফ দিল। আমিও সেই সঙ্গে গুলি ছুড়লুম। ভগবানকে ধন্যবাদ—লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি। ভীষণ গর্জ্জন করে সিংহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—আর নড়ল না।

আমার দিকে আর আক্রমণের সম্ভাবনা নেই জেনে, ওদিকে তাকিয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠলুম। দেখি, একটা ভয়ঙ্কর সিংহী কারামোজাকে লক্ষ্য করেছে। জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করে কারামোজা তার হাতের বর্শাটা ছুড়লে, কিন্তু লক্ষ্য তার ব্যর্থ হোল। শেষ সম্বল হাতের অস্ত্রটাকে হারিয়ে প্রাণভয়ে সে লরীর জিনিষ-পত্রের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল।

আর বুঝি রক্ষে নেই। গেল—গেল বলে, সভয়ে আমি চোখ বুজলুম। পরক্ষণে চেয়ে দেখি, রঞ্জিত তার বন্দুকটা তুলে নিলে। তাজা রক্তে তার হাত আর জামার হাতা ভিজে গেছে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল ছিল না মোটেই।

কারামোজাকে তাক্ করে সিংহীটা লাফ দেবার সঙ্গে

সঙ্গে তার বন্দুকটা গর্জ্জন করে উঠল,—গুড়ুম। একটা তীব্র করুণ আর্ত্তনাদ করে পশু-সম্রাজ্ঞী লুটিয়ে পড়ল—স্থির-নিস্পন্দ হয়ে।

রঞ্জিতই আজ কারামোজার প্রাণ দিলে।

দু'টো সিংহ আর তিনটে সিংহী মরার সঙ্গে সঙ্গে বাকী-গুলো রণে ভঙ্গ দিয়ে বাচ্ছাদের নিয়ে পালাল।

বিকারের রোগীর মত একটা ঝোঁকের মাথায় যেন এতক্ষণ লড়ছিলুম। ভেতরে ভেতরে যে কতখানি ক্লান্ত হয়েছিলুম, তা বুঝতে পারি নি। এইবার হুঁস হতে দেখি, অবসাদে সর্ব্ব শরীর ভেঙে আসছে।

ঠেস দিয়ে বসে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, আঃ!

রঞ্জিত তখুনি ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, আঃ কিরে? চালা—চালা, তুই কি ভুলে গেলি…

সত্যিই কমিশনারের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে চালাতে যাব—পেছন থেকে আদেশ এল: পালাবার চেষ্টা না করে, মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়া হতভাগারা।

কমিশনার এসে গেছে।

রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলে উঠল। সিংহদের সঙ্গে যুদ্ধ করলুম কি শেষে কমিশনারের হাতে ধরা পড়বার জন্যে? আমাদের এত চেষ্টা—এত পরিশ্রম কি সবই বিফলে যাবে?

ভাবতেই মাথা যেন খারাপ হয়ে গেল। না, এ কথনই

হতে পারে না। লরীতে ষ্টার্ট দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি আমার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে বিঁধল।

রঞ্জিত বললে, ও চেষ্টা তোমার বৃথা, সুজিৎ। এখন আমরা ফাঁদে পড়েছি, কিন্তু উদ্ধার পাবার আশা ছাড়িনি।

কমিশনারের আদেশ কাণে এল ঃ ইঞ্জিন বন্ধ করে যে যার জায়গায় হাত তুলে বসে থাক। কথা না শুনলে কোন রকম দয়া-মায়া করব না।

রঞ্জিত ধীরে ধীরে সুইচ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর মাথার ওপর হাত দুটো তুললে দেখা গেল, তার জামার হাতা ছেঁড়া, হাত রক্তাক্ত। সে গাড়ী থেকে নেমে কমিশনারের কাছে চলল—মুখে তার মৃদু মৃদু হাসি।

হাত দুটো উঁচু করে আমি ঘুরে বসলুম। আমি, কারা-মোজা আর করঙ্গো নিষ্ফল রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে তাল-পত্রের পাশে লুকোতে চেষ্টা করছে। ভন টর্টের ঠাট্টার হাসিও কাণে এল।

প্রায় গজ চল্লিশ দূরে ঝোপের মধ্যে কমিশনার আর তার সশস্ত্র বাহিনীকে দেখতে পেলুম। রঞ্জিতকে এগুতে দেখে কমিশনার বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরলে—তাকে লক্ষ্য করে।

কমিশনার আর তার লোকবল দেখে দমে গেলুম। মনে হোল, এদের সঙ্গে রঞ্জিত কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না। সব চেয়ে রাগ হোল আমার—কমিশনারের সঙ্গে ভন টর্টের ছেলে—বাচ্ছা শুয়ার পিয়েটটাকে দেখে।

ভন টর্ট আমার দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, কি বলেছিলুম ? দেখ তোরা ধরা পড়লি কি না ?

রঞ্জিতের কাণে কথাটা গেলেও সে গ্রাহ্য করলে না। কমিশনারের দিকে চেয়ে বললে, এত সৈন্য নিয়ে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে এসেছেন ? আমরা ত চোর-জোচ্চোর নই।

কমিশনার কঠিন স্বরে বললে, তোমার নাম রঞ্জিত ? তুমি আমায় বড্ড হায়রাণ করেছ।

রঞ্জিত বললে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ?

—তুমি ছ'জন পুলিশকে মারপিট করেছ; সার্জ্জেণ্ট হেমিসিংকে খুন করেছ; বেআইনী ভাবে ভন টর্টকে আটক করে তার খানসাই চাকর কারামোজাকে কেড়ে নিয়েছে আর কতকগুলো ওয়াবান্দি ও তাদের সর্দ্দারকে খুন করেছ।

রঞ্জিত বললে, ব্যস্, শুধু এই !

কমিশনার রেগে বললে, আমার এলাকার মধ্যে তোমার গুণ্ডামি করা আজ থেকে শেষ !

রঞ্জিত বললে, আমাদের একমাত্র অপরাধ—আমরা ওয়াবনিদের হাতীর দাঁতের খোঁজে বেরিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ—সে সমস্তই ভন টর্টের কারসাজি।

ভন টর্ট গর্জ্জন করে উঠল, সব মিছে কথা।

তার প্রতিবাদে রঞ্জিত রাগ করলে না; বলতে লাগল, ভন টর্ট লোকটা ভীষণ। আপনাকে আমি কতকগুলো কথা বলতে চাই, তাহলেই বুঝবেন দোষী কে।

রঞ্জিত যে কমিশনারকে সত্য ঘটনা বিশ্বাস করাতে পারবে না—তা বুঝলুম ; সে শুধু চায়, এই রকমভাবে দেরী করতে করতে পালাবার একটা সুযোগ

কমিশনার এত সহজে ভুললো না। বললে, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার হাতে বালাগুলো লক্ষ্মী ছেলের মত পর ত।

আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না ?—রঞ্জিত বললে।

দৃঢ় স্বরে কমিশনার বললেন, এক বর্ণও না। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ...

দুঃখিতের ভাণ করে রঞ্জিত প্রশ্ন করলে, ধরা না দিলে আপনি বোধ হয় আমাদের ঘিরে ফেলতে আদেশ দেবেন ?

—হ্যাঁ।

কথা কইতে কইতে কখন যে রঞ্জিত লরীর আমার এসে দাঁড়িয়েছিল, লক্ষ্য করিনি। আমাকে জোরে চালাতে বলেই হঠাৎ সে—যেখানে মালপত্র ছিল সেইখানে উঠে পড়ল।

আমি প্রতি মুহূর্তেই রঞ্জিতের মুখে এই কথাটা শোনবার আশা ক'রছিলুম। তার কথা শেষ হতে না হতেই লরী তীর-বেগে ছুটল।

কমিশনারের আদেশ কাণে এল : গুলি ছুড়তে ছুড়তে পেছনে ধাওয়া কর। ধরা চাই।

রঞ্জিত দেখি, বন্দী ভন টর্টকে ঢালের মত সামনে তুলে ধরে চীৎকার করে বললে, যত ইচ্ছে গুলি ছোড় সব, কিন্তু মনে রেখো, তোমাদের প্রথম শিকার হবে এই বুড়ো ভন টর্ট।

= তেরো =

বিপন্ন

কমিশনার আমাদের দু'জনকে ঘাল করতে চান দেখে রঞ্জিত আমাকে আড়াল করে বসল আর ভন টর্টকে রাখলে শিখণ্ডীর মত সামনে।

বহুদূর থেকে কাণে ভেসে এল : দোহাই আপনার, গুলি করা বন্ধ করতে বলুন, নইলে আমার বাবা মারা যাবেন। বুঝলুম, স্বর থোয়েটের।

গুলি যে আর ছোঁড়া হবে না—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ ছুড়লে ভন টর্টের মৃত্যু না হোক, আঘাত সে পাবেই।

চেয়ে দেখি, পেছনে কলরব করতে করতে কমিশনার দলবল নিয়ে ছুটে আসছে। কিন্তু তার জন্যে আমি একটুও ভাবিনি। পথ বাধাহীন, আমার নাগাল পায় কে ?

পেছিয়ে-পড়া কমিশনারের দলকে উদ্দেশ করে কারামোজা আর করঙ্গো বলে উঠল, চললুম কলা দেখিয়ে। গাধার দল সব—বাওয়ানার সঙ্গে চালাকি খেলতে এসেছ !

তাদের কথার ধরণে আমরা না হেসে থাকতে পারলুম না।

করঙ্গো আনন্দে তার হাড়ের লাঠিটা ঘোরাতে লাগল।

সেই সময়ে লরীটা একটা উঁচু-নীচু জায়গায় পড়ে ভীষণ দুলে উঠল। ভন টর্টও রঞ্জিতের হাত ফস্কে নীচে পড়ে গেল। কারামোজা রঞ্জিতকে পড়-পড় অবস্থায় ধরে ফেললে বটে, কিন্তু ভন টর্টকে ধরতে পারলে না।

শত্রুদল পেছনে, কাজেই লরী থামান যুক্তিযুক্ত মনে হোল না। কিছুদূর যাবার পর নীচে হল্‌দে জমি দেখতে পেলুম। বুঝতে পারলুম, সামনে বালু-সাগর; আমরা মরুভূমির ভেতর প্রবেশ করছি। দূরে বাঁদিকে কতকগুলো পাহাড়—মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপাশ থেকে যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

করঙ্গো চীৎকার করে উঠল, ওই পাহাড়গুলোর ভেতর পিশাচ-দানার হ্রদ। ওখানে যাবেন না, বাওয়ানা, সোজা চলে চলুন।

করঙ্গোর ভয় দেখে আমরা হা হা করে হেসে উঠলুম।

হঠাৎ নজরে পড়ল, পাহাড়ের ওপর কমিশনার দলবল নিয়ে আসছে। অবশ্য তারা অনেক দূরে; এত দূর যে, তাদের যেন বামনের মত দেখাচ্ছে।

সেই দিকে চেয়ে রঞ্জিত বললে, মরুভূমিতে আমাদের বাধা পাবার সম্ভাবনা কম; মনে হয়, ওরা আর আমাদের ধরতে পারবে না। কিন্তু সুজিৎ, হাওয়াটা যেন আমার ভাল ঠেকছে না!

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন, কি হয়েছে?

রঞ্জিত বললে, হাওয়ার বেগটা যেন ক্রমশঃ বাড়ছে।

বালির রাজ্যের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। মাঝে মাঝে দু' গাছ দেখা যাচ্ছে। মাথার ওপর শকুনের দল; তাদের খাবারের খোঁজে নীচের দিকেই ফিরছে।

চলতে চলতে বালির মধ্যে কতকগুলো ঘোড়া আর গরুর কঙ্কাল দেখতে পেলুম, দু' একখানা ভাঙ্গা গাড়ীও। কোন্ হতভাগ্যেরা হাতীর দাঁতের খোঁজে এত দূর এসেও প্রাণ হারিয়েছে। মরণের সময় না পেয়েছে এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল, না পেয়েছে আত্মীয়-স্বজনের হাতের স্নেহস্পর্শ।

বুকটা যেন মুহূর্ত্তের জন্যে কেঁপে উঠল।

মনে মনে বললুম, যদিও হাতীর পাল আমাদের অনেক জিনিষ-পত্র নষ্ট করে দিয়েছে, তবুও আমাদের সঙ্গে যে জল আর খাবার আছে—তা এই মরুদেশ পার হবার পক্ষে যথেষ্ট।

বাতাস ক্রমশঃই গরম হয়ে উঠল; তারপরেই উঠল ঝড়। দূর চক্রবাল-রেখা চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেল—আকাশ পড়ল বালির পর্দ্দায় ঢাকা! বাতাস এত ভারি হয়ে উঠল যে, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট বোধ হতে লাগল।

করঙ্গো আর কারামোজা একটা ছেঁড়া কম্বলে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঢেকে গুড়ি-শুড়ি হয়ে বসে আছে। শুধু তাদের চোখদু'টো দেখা যাচ্ছিল—সে চোখে ভয়ের চিহ্ন। রঞ্জিত আমার দিকে ফিরে বললে, তুই কিন্তু গাড়ী থামাসনি সুজিৎ, করঙ্গো যেদিকে যেতে বলছে, ঠিক সেইদিকে চল।

পাহাড় আর দেখা না গেলেও তবু সেইদিক লক্ষ্য করেই লরী ছুটিয়ে দিলুম।

কিন্তু হঠাৎ ঝড়ের গতি আরও বেড়ে উঠল।

কি সে গর্জ্জন! শুনলে কাণে তালা লাগে। যারা এ ঝড়ের পাল্লায় পড়েনি, তারা কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা হাঁফাতে লাগলুম! দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। গায়ে মুখে বালুকণা এসে বিঁধে—ঠিক যেন তীক্ষ্ণ-ফলা তীরের মত।

রঞ্জিত আমার কাণের কাছে মুখ এনে চীৎকার করে বললে, সোজা চালা সুজিৎ, করঙ্গো সামনের দিক দেখিয়ে তার লাঠিখানা ধরে আছে। সে আমাদের ঠিক পথ দেখাতে পারবে। তারপর হেসে বললে, এটা যাদুবিদ্যা বলে ভাবিস নি। আফ্রিকার বুনোদের পথ চেনবার শক্তি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।

গরম হাওয়া আর বালির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি ষ্টীয়ারিং-এর ওপর মাথা রেখে চালাতে লাগলুম। কিন্তু আলো ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

ক্রমে চারদিক যেন কালো পর্দ্দায় ঢেকে গেল। অন্ধকার এত গাঢ় যে, পরস্পরকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম না, তবু অন্ধের মত ঝড় ঠেলে লরী ছুটে চলল। কিন্তু মিনিট দশেক চলার পর পথ গেল হারিয়ে।

রঞ্জিতও দেখলুম, এই ঝড়ে কিছুই স্থির করতে পারছে না। কিন্তু করঙ্গো তার লাঠিটা আবার তুলে ধরলে।

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপগুলির কতকগুলো নাবিক যেমন দিক্-নির্ণয় যন্ত্র ছাড়াও অকূল সমুদ্রে তাদের নৌকা ঠিক পথে চালায়, তেমনি আফ্রিকার কতকগুলো বুনো লোক, দেখতে না পেলেও অন্ধকারে পথ ঠিক করে যেতে পারে—এটা যেন তাদের জন্মগত সংস্কার।

রঞ্জিত বললে, থামিস্‌নি সুজিৎ, আমরা ঠিক জায়গাতেই পৌঁছব। কিন্তু কমিশনার যদি আমাদের তাড়া ক'রে এসে থাকে, তবে তার অবস্থা শোচনীয়।

ঝড় থামার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। উদ্দাম বায়ুর একঘেয়ে হাহাকার শুনতে শুনতে কাণে যেন তালা ধরে গেল।

মনে হচ্ছিল যেন কত কাল ধরে এই ঝড়ের মধ্যে ছুটে চলেছি—শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে, কিন্তু থামতে পারছি না। আমাদের চলার—যেন আর সীমা নেই, শেষ নেই। মৃত্যু-দিন পর্য্যন্ত হয়ত এ আমাদের এমনই টেনে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ রঞ্জিতের চীৎকারে সজাগ হয়ে উঠলুম। সে বলছে, ঐ যে ফাঁকটা দেখলুম, ওটা ঠিক সেই গিরিপথ; যে পথ দিয়ে সিংহদের মেরে আমরা এলুম। আমরা নিশ্চয়ই গোল পথে ঘুরে আবার ঐ দিকেই যাচ্ছি।

আমিও সেই ভাঙ্গা গাড়ী আর কঙ্কালগুলো দেখতে পেলুম!

এই সময় করঙ্গোও চীৎকার করে উঠল। এতক্ষণে সেও তার ভুল বুঝতে পেরেছে। এই ঘণ্টা খানেক একটা বৃত্ত ধরে আমরা ক্রমাগত ঘুরেছি। এত কষ্ট সব পণ্ডশ্রম।

কিন্তু এর জন্যে করঙ্গোকে দোষ দেওয়া যায় না। বোধ হয় সে লরীতে উঠে দিক ভুল করে ফেলেছে।

আর এগিয়ে যাওয়া নিরর্থক। তাই রঞ্জিত হাসতে হাসতে আমাকে থামতে বললে।

গাড়ী থামাতেই সে বলে উঠল, উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল। অথচ সঙ্গে এত······হঠাৎ অসমাপ্ত কথার মাঝপথে থেমে, সে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল, ওটা কি ?

অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চলে না ; তবুও রঞ্জিত যেখানটা দেখাচ্ছিল, বহু চেষ্টার পর মনে হল, সেখানে যেন জন চারেক মানুষকে দেখতে পেলুম।

ঠিক সেই সময়ে তাদের একজন মাটিতে পড়ে গেল। ওঠবার জন্যে সে বার কয়েক বৃথা চেষ্টা করল, কিন্তু পারলে না। তার তিনজন সঙ্গী দেখি, তার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে।

আবার নূতন করে একটা দমকা হাওয়ায় এক রাশ বালি উড়ে এসে দূরের সে দৃশ্যটার ওপর কালো যবনিকা ফেলে দিলে।

—

Raja Rajbullav ... 1953.

=চোদ্দ=

উদ্ধার

বালির আড়ালে লোকগুলো অদৃশ্য হলে রঞ্জিত গম্ভীর ভাবে বললে, লোকগুলোকে দেখতে পেলি, সুজিৎ ?

বললুম, হ্যাঁ, ও বোধ হয় কমিশনার।

আমার কথার জের টেনে রঞ্জিত বললে, আর তিনজন পুলিশ। এই ঝড় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন চলতে পারে, তাহলে ওরা তেষ্টার চোটেই মরে যাবে !

রঞ্জিতের কথা শেষ হলে বললুম, চল্, আমরা কমিশনারকে উদ্ধার করে আনি—যাবি ?

রঞ্জিতের মুখে খুসীর হাসি ফুটে উঠল ; বললে, আমারও সেই ইচ্ছে, সুজিৎ। জানি ও আমাদের ভীষণ শত্রু। এখন মারা গেলে আমাদের লাভ বই লোকসান নেই ; তবুও সাধ্য থাকলে শত্রুকে নিশ্চিত মরণের মুখে ফেলে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়।

বললুম, কিছুতেই নয়, তাতে আমাদের যতই বিপদ হোক্।

লরী থেকে নেমে রঞ্জিত বললে, তবে আয়। তারপর

কারামোজা আর করঙ্গোর দিকে ফিরে বললে, আমরা কমিশনারকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। তোমরা এইখানেই থাক।

কারামোজা চীৎকার করে উঠল, সে কি কথা, বাওয়ানা! আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।

রঞ্জিত অল্প হেসে বললে, হ'তে পারে কারামোজা। কিন্তু থাক্ সে কথা। তবে ওদের নিয়ে এলে তুমি যেন কাউকে বর্শা-টর্শা মেরে ব'স না।

রঞ্জিতের এ ভয় মিথ্যে নয়—বুনোদের যদি বিশ্বাস হয় —এতে প্রভুর ভাল হবে, তবে ওরা সব কিছুই করতে পারে।

আমরা তাদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি—এই কথাটা যদি কমিশনারের অনুচরেরা বুঝতে না চায়, তাই বন্দুক দু'টো সঙ্গে নিয়ে সেই ঝড় মাথায় ক'রে রওনা হলুম।

ভুল আমাদের হয়নি। আমাদের অনুসরণ করতে এসে মরুভূমির মধ্যে কমিশনার আর তার লোকেরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে কমিশনার আহত। পুলিশ তিনজন তারই সেবায় ব্যস্ত।

বন্দুক লক্ষ্য করে আমরা তাদের নিকটবর্ত্তী হলে, তারা আমাদের দেখতে পেয়ে গর্জ্জন করে উঠল।

তীব্র স্বরে রঞ্জিত আদেশ করলে, এখনি তোমাদের বন্দুক সব ফেলে দাও মাটিতে।

তারা বোধ হয় আমাদের রক্ত-পিপাসু জানোয়ার বলেই ভেবে নিলে। কারণ দেখলুম, মুহূর্ত্তে তাদের চোখগুলো জ্বলে

উঠল। কিন্তু ফাঁদে পড়ে গেছে দেখে, বন্দুকগুলো ফেলে দিয়ে গালাগালি দিতে লাগল।

রঞ্জিত ধমক দিয়ে বলে উঠল, চুপ্।

রঞ্জিতের ধমকে তারা চুপ করে গেল। সে তখন কমিশনারের কাছে এগিয়ে গেল। তাকে দেখেই আঘাত ভুলে কমিশনার উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল। কর্কশ স্বরে বললে, তুমি!

রঞ্জিত বললে, হ্যাঁ, খুব শুভক্ষণে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে —অবশ্য যখন তুমি জান না এর পরে তোমার ভাগ্যে কি আছে—কেমন?

কমিশনারের মুখে কোন উত্তর যোগাল না। দুর্ব্বল শরীরে তার পক্ষে দাঁড়াতেও কষ্ট বোধ হচ্ছিল। তত্রাচ রাগে সে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল, শয়তান, হাতে যখন পেয়েছিস তখন তুই ছাড়বি না জানি। আমিও তোর কাছে দয়া ভিক্ষা কোরব মনে করিসনি। নে তোর কাজ কর্—চালা গুলি।

শান্ত স্বরে রঞ্জিত বললে, চোর ডাকাত ভেবে অনেক অত্যাচার তুমি আমাদের ওপর করেছ, কমিশনার। কিন্তু আমরা তোমায় মারতে আসিনি।

কমিশনার তখনও রঞ্জিতের কথা বিশ্বাস করতে পারলে না। চীৎকার করে বললে, খেলিয়ে তোলবার দরকার নেই। আমাদের হত্যা করা যদি তোমার মতলব না হোত, তাহ'লে এত ক্ষণ পালিয়ে যেতে পারতে—ফিরলে কেন?

রঞ্জিত হাসতে হাসতে বললে, তুমি আবার ভুল করছ

কমিশনার। তুমি মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ। এই ঝড় হয়ত দিনের পর দিন চলতে পারে, কাজেই পথ তোমরা ঝড় না থামা পর্য্যন্ত খুঁজে পাবে না। এখান থেকে চল্লিশ মাইলের মধ্যে এক ফোঁটাও জল নেই। তাই তোমাদের আমার লরীতে নিয়ে যেতে এসেছি, কমিশনার।

রঞ্জিতের কথা শুনে কমিশনার হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার মুখ দেখে মনে হোল, সে রঞ্জিতের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু নিরুপায়, রঞ্জিতের বন্দুক উদ্যত।

রঞ্জিতের কথা মত আগেই আমি ওদের বন্দুকগুলো থেকে টোটা বার করে নিয়েছিলুম; এবার বন্দুকগুলোও কুড়িয়ে নিলুম। রঞ্জিত বললে, লরী দাঁড়িয়ে আছে, একে একে এগিয়ে চল।

অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা লরীর কাছে এসে উপস্থিত হলুম। রঞ্জিত চীৎকার করে বললে, কারামোজা, জল নিয়ে এস।

রঞ্জিতের আদেশে জল এলে বন্দীরা আকণ্ঠ পান করলে। ঝড় না থামা পর্য্যন্ত আমরা লরীর তলায় আশ্রয় নেব ঠিক করেছিলুম।

রঞ্জিত বন্দীদের খেতে দিয়ে কমিশনারকে বললে, তোমাকে আমি কিছুই করতে চাই না, কমিশনার, শুধু তুমি আমাকে কথা দাও যে, তুমি পালাতে চেষ্টা করবে না।

বিস্ময়ে কমিশনার হতবুদ্ধি হয়ে গেল; একটু পরে বললে, আমি এখন তোমার হাতের মধ্যে। তোমাকে যত

খারাপ ভেবেছিলুম—ততটা তুমি নও। আমাদের ছেড়ে দাও না কেন ?

রঞ্জিত বললে, দেখ, তোমাকে না ডেকে এনে ঐখানেই মরতে দিতে পারতুম। তোমাকে নিয়ে এলুম এই আশায় যে, এবার হয়ত তুমি মন দিয়ে আমার কতকগুলো কথা শুনবে।

কমিশনার বললে, বেশ, বল।

রঞ্জিত ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বলে গেল।

কমিশনার সমস্ত শুনে আমাদের মুখের দিকে তাকালে। তারপর বললে, বেশ, আমি তোমাদের সঙ্গে হাতীর দাঁতের খোঁজে যেতে রাজী আছি। কিন্তু হাতীর দাঁত পাওয়া যাক বা নাই যাক, ফিরে এলে তোমাদের অভিযোগের বিচার হবে—এতে রাজি ?

রঞ্জিত বললে, আমরা খুব রাজি। ভন টর্ট আর পিয়েটকে একবার ধরতে পারলে সত্য ঘটনা প্রকাশ পেতে দেরী হবে না।

*　　*　　*

পরদিন সকালে ঝড় থেমে গেল। বাকী পুলিশগুলোর কি অবস্থা হোল—সে সম্বন্ধে আমাদের কোন উদ্বেগ ছিল না। রঞ্জিতের আদেশে আমরা সকলে লরীতে উঠে পড়লুম। অবস্থার এই পরিবর্ত্তনে আমরা খুব আনন্দিত হলুম ; কারামোজা আর করঙ্গোও কম নয়।

*　　*　　*　　*

সামনে মানুষের মুণ্ডের মত একটা পাহাড়ের চূড়া দেখে আনন্দে চীৎকার করে উঠলুম, কারামোজা, ঐ কি মানুষের মত সেই পাহাড় ?

মরুভূমি পেরিয়ে তিন দিন অবিরাম চলার পর একটা শ্যামল দেশের মধ্যে এসেছি। অল্প দূরেই পাহাড় ; চারদিকে ফার্ণ গাছ।

কারামোজা আর করঙ্গো তিনজন পুলিশের সঙ্গে লরীর উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজনায় তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। কমিশনার সাহেবও দেখি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে।

এই তিনদিন বাধ্য হয়ে কমিশনার আমাদের অতিথি। বুঝতে পারছি, আস্তে আস্তে আমাদের সম্বন্ধে তার ধারণা বদলে যাচ্ছে।

কারামোজা বললে, বাওয়ানা, নিশ্চয়ই ঐ পাহাড়টা। সর্দ্দার —আমার বাবা যে রকম ব'লে···

তাকে বাধা দিয়ে করঙ্গো বলে উঠল, ওরই ওধারে ওয়া-বনিদের গ্রাম। জোয়ান বয়েসে একবার আমি এই পাহাড়ে এসেছিলুম, কিন্তু হাতীর দাঁতের সন্ধান পাইনি। হাতীর দাঁত এখনও ওখানে আছে কি না······

এবার পাহাড়টা আমরা সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি। এরই জন্যে আমাদের এত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এরই ওপাশে হাতীর দাঁত আছে। মনের মধ্যে আনন্দ—উত্তেজনায় ঢুপ ঢুপ করতে লাগল।

যেতে যেতে দুধারে কতকগুলো হরিণ দেখতে পেলুম, কিন্তু না পেলুম কোন লোককে দেখতে, না তাদের বাড়ী-ঘর।

বৃষ্টিই এখন আমাদের প্রধান বাধা। কারণ করঙ্গো বললে, পথে নদী আছে।

সকলে এত আনন্দিত হয়ে উঠেছিলুম যে, বাইরের কোনদিকে তাকাবার সময় ছিল না।

তীরবেগে লরী চালিয়েছি। রঞ্জিত বললে, এই সব নদীতে ঘণ্টায় পনর ফুট জল বাড়ে। মেঘও একখানা উঠেছে…

রঞ্জিতের আশঙ্কাই সত্য হোল। প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা পরে ভীষণ বেগে বৃষ্টি নামল—লরীর খোলা অংশের সকলকে ভিজিয়ে দিয়ে। গাড়ীর গতি কিন্তু বন্ধ হল না।

বৃষ্টিতে সব ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। কিছুই প্রায় দেখা যায় না। পাহাড়ের ঢালু পথে নামছি। বাজের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখি—সামনেই নদী।

এইটেই আমাদের পথে প্রথম নদী। স্রোত ভয়ানক বেড়েছে। আমরা যে পথে চলছিলুম, সেই পথে মহিষগুলো নদী পার হয়। সেইখান দিয়েই নদী পার হলুম।

রঞ্জিত বললে, বড্ড সময়ে এসে পড়েছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে এ জায়গারও জল খুব বেড়ে যাবে।

পরের নদীটায় কিন্তু বিশেষ সুবিধা হোল না—মাঝখান থেকে আমাদের ফিরে আসতে হোল। অগত্যা নদীর ধার দিয়ে আমরা পেরোবার মত একটা জায়গা খুঁজতে লাগলুম।

অবশেষে পথ একটা মিলল। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। চারদিকে জল থৈ থৈ করছে। নদীর এই পথটা যথেষ্ট উঁচু। নদীও এখানে প্রায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললুম, এই পথটা বেশ ভাল। দেখ, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তোমাদের ওপারে নিয়ে যাচ্ছি।

রঞ্জিত আমাকে বাধা দিয়ে বললে, তাড়াতাড়ির কাজ নয়, সুজিৎ। প্রতিপদে আমাদের বুঝে সুঝে কাজ করতে হবে। দেখতে উঁচু হলেও যদি প্রথমে ছ' ফুট জলে আমাদের নিয়ে গিয়ে ফেলিস—অবশ্য নিজেদের ভাবনা ভাবি না, কিন্তু লরীটা ত সাঁতার জানে না!

কমিশনার হেসে উঠল; বললে, আমাদের জলের পরিমাণটা ঠিক মত জেনে নামাই উচিত।

লরী থামিয়ে বাধ্য হয়ে আমি নেমে পড়লুম।

=পনেরো=

পথের শেষে

নেমে দৌড়ে নদীর ধারে গেলুম। পথের ধারে ধারে ঝোপ ; আমি যাবামাত্র কতকগুলো রঙ্-বেরঙের হাঁস উড়ে গেল।

হাঁসগুলোকে দেখতে দেখতে নদীর আরও ধারে গিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ কমিশনারের চীৎকার কাণে এল ঃ ওখান থেকে পালিয়ে এস—পালিয়ে এস, এক্ষুণি···চম্‌কে পেছন ফিরে দেখি, রঞ্জিত বন্দুক হাতে দৌড়ে আসছে।

বিস্মিত হয়ে চারদিকে চাইলুম, কিন্তু কই! কোন কিছু ত দেখতে পেলুম না! বললুম, রঞ্জিত, এখান দিয়ে আমরা খুব পেরিয়ে যেতে পারব।

রঞ্জিত কোন জবাব দিলে না। সেই মুহূর্ত্তে তার বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল, আর আমার পায়ের খুব কাছ থেকে কি যেন একটা ভারী জিনিষ লতা পাতা ছিঁড়ে পালাল।

ভয়ে আমি পড়ে গেলুম। চকিতের মত পলায়মান জীবটি একবার নজরে পড়ল। বাপরে! একটা প্রকাণ্ড কুমীর। রঞ্জিতের গুলি খেয়ে সেটা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্ত জলটাকে যেন তোলপাড় করে তুলল।

হাঁফাতে হাঁফাতে বললুম, বড্ড বেঁচে গেছি, ভাই।

রঞ্জিত বললে, হ্যাঁ, তোকে ল্যাজে করে প্রায় ঝাঁপ্টা মেরেছিল আর কি! খালি হাতে কখনও কোথাও যাস নি—আর সব সময় হুঁসিয়ার থাকিস।

ইতিমধ্যে কমিশনার এবং আর আর সকলে এসে পড়ল। নদীর গভীরতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে লাগলুম। তীরের কাছে একটা কাঠি ডুবিয়ে দেখা গেল, সেখানকার গভীরতা প্রায় তিন ফুট। কি করা যায়—সেই বিষয়ে আমাদের জল্পনা-কল্পনা চলল।

সকলকে থামিয়ে দিয়ে রঞ্জিত বললে, আমি নেমে দেখব এখানে নদী কত গভীর। তোমরা শুধু লক্ষ্য রেখ, কুমীর যেন ভেসে না ওঠে।

রঞ্জিতের স্বভাবই এই। বিপদের মুখে সে অন্য কাউকে প্রাণ থাকতে পাঠাবে না। অন্য কোন উপায় ভেবে না পেয়ে আমরা বাধ্য হয়ে এইভাবে পরীক্ষা করতে মত দিলুম।

ছ'টা বন্দুক এক সঙ্গে গর্জ্জে উঠল। এক সঙ্গে ছ'টা গুলি পড়াতে নদীর জল ফুলে উঠল। আমাদের গুলি ছোড়ার উদ্দেশ্য—ঐ জায়গায় কোন প্রাণী থাকলে ভয় সে সরে যাবে।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে রঞ্জিত জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তীরে দাঁড়িয়ে আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তার দিকে চেয়ে রইলুম। যতই সে এগোতে লাগল, ততই জল তার দেহের

ওপর দিকে উঠছে দেখলুম। জল প্রায় তার কাঁধ পর্য্যন্ত উঠেছে। এই সময় মনে হোল, যেন সে হঠাৎ পড়ে যাচ্ছে।

বন্দুকটা কাঁধের উপর তুলতে তুলতে ব্যাকুল কণ্ঠে ব'লে উঠলুম, কোন কিছুতে রঞ্জিতকে ধরল নাকি?

রঞ্জিত চীৎকার করে বললে, ভয় নেই। একটা গর্ত্তের মধ্যে পা পড়ে গেছে।

খানিক বাদে সে জল থেকে উঠে এল। বললে, লরী নিয়ে পার হওয়া যেতে পারবে না।

তাহলে অন্য পথ ত আমাদের খুঁজে বার করতে হবে—কমিশনার বললে।

আমার মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলল। বললুম, রঞ্জিত, থাম, লরীটা আমরা ওপারে ভাসিয়ে নিয়ে যাব ভেলার মত।

রঞ্জিত আমার কথাটা বুঝল না। বললে, মাথায় তাহলে তোর সূর্য্যের তাপ লেগেছে?

সামনের সিডার গাছগুলো দেখিয়ে বললুম, এগুলোর ডালপালা নিয়ে লতা দিয়ে বেঁধে একটা ভেলা তৈরী করব। সেই ভেলায় চড়িয়ে লরী নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ হবে।

রঞ্জিত উৎসাহে আমার পিঠ চাপড়ে বললে, বেশ, বেশ। তারপর কমিশনারের দিকে চেয়ে বললে, যদিও সুজিৎ নিজেকে কুমীরের মুখে ধরে দিতে যায়, তবুও ওর বুদ্ধি আছে।

সকলেই আনন্দে কাজে লেগে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল শুধু গাছ কাটা। তারপর গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি,

ডাল-পালা শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে একটা প্রকাণ্ড ভেলা তৈরী হোল। রঞ্জিত সাঁতরে ওপারে গিয়ে একটা সিডার গাছে দড়ি বেঁধে দিলে। দড়িটা এধারেও এক সিডার গাছে বাঁধা হোল—পার হবার সময় সকলে আমরা সেটা ধরে থাকব, যাতে স্রোতে ভেলাটা ভেসে যেতে না পারে।

স্রোতের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝতে যুঝতে কোন রকমে আমরা এপারে পেঁ ছিলুম। ভয় হচ্ছিল—জলহস্তীর। যদি দেখা হোত, তবে সকলকে যে নদীগর্ভে আশ্রয় লাভ করতে হোত—তাতে আর কোন সন্দেহ-ই নেই।

পার হবার দড়িটা রঞ্জিত খুলে নিলে পর আমি আবার লরী চালিয়ে দিলুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে—সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পরেও কিন্তু কেউ ক্লান্তি বোধ করছি না।

হাতী চলার পথ ধরে আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। কিছু দূর ওঠবার পর কমিশনার বললে, আমরা অনেকটা উপরে উঠেছি। এখন বরং নেমে খোঁজ করা দরকার।

কমিশনারের কথাই ঠিক মনে হোল। লরী থামিয়ে আমরা নেমে পড়লুম। তখন মনের মধ্যে যে কি হচ্ছিল, তা বলে বোঝান যায় না।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো এসে প'ড়েছে। আমরা দল বেঁধে নিলুপ্ত গ্রামের সন্ধানে চলেছি। চারদিক নিস্তব্ধ—শুধু আমাদের চলার শব্দ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

কিছুদূর চলার পর কাণে এল—হায়না আর চিতার ডাক, হাতীর পায়ের শব্দ।

বড় বড় কতকগুলো দাগ দেখিয়ে রঞ্জিত বললে, বামন হাতী। অনিষ্ট এরা বিশেষ করে না। তবে এদের কামড়ান বরং সহ্য হয়, কিন্তু ডাক সহ্য হয় না। আচ্ছা, ভন টর্টের কি খবর বল ত, সুজিৎ?

বললুম, সে পালিয়েছে—আর আমাদের বিরক্ত করতে আসছে না।

মাথা নেড়ে রঞ্জিত বললে, না, তোর এ ধারণা ভুল। ভন টর্ট শেষ পর্য্যন্ত না দেখে কখনই ফিরবে না। আজ থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

কারামোজার চীৎকারে আমাদের চমক ভাঙ্গল। সে বলছে, ওয়াবনি গ্রামে আমরা পেঁাছেচি।

আনন্দে আমার সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলুম, ঘরবাড়ীর চিহ্ন কোথাও নেই, শুধু বেড়া দিয়ে ঘেরা কতকটা জায়গা। আমরা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বাঁদর কিচির মিচির করতে করতে পালাল। এ সমস্ত দেখে আমাদের সকলের উৎসাহ যেন নিভে গেল।

কমিশনার নিরাশ কণ্ঠে বললে, তোমরা আকাশ-কুসুমের পেছনে ছুটে এসেছ বলে মনে হয়। হাতীর দাঁতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল। পাহাড় ত দূরের কথা, একটা সামান্য টুকরোও তোমরা পাবে বলে আশা রাখ?

রঞ্জিত বললে, এই পাহাড়ের প্রত্যেকটা জায়গা তন্ন তন্ন করে না খুঁজে আমরা নড়ব না।

—কাজটা সহজ নয়—কমিশনার বললে।

রঞ্জিত উত্তর করলে, তা হোক্।

আমরা চারদিকে খুঁজতে ছড়িয়ে পড়লুম। কিন্তু কত-কাল হয়ে গেল কুঁড়েগুলো পড়ে গেছে—তাদের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া দায়। বেড়া দেওয়া এই প্রকাণ্ড জায়গাটা এখন বাঁদর, পেঁচা আর সাপের বাসভূমি হয়েছে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে বড় একটা ফাটল ছিল। আমাদের সকলকে অনুসরণ করতে বলে রঞ্জিত বন্দুক হাতে সেই দিক পানে অগ্রসর হোল।

ফাটলটা যেমন সরু, তেমনি অন্ধকার। অন্ধকারে এই ফাটলের মধ্যে ঢুকতে ভয় হতে লাগল—কি জানি কোথায় এই ফাটলের শেষ—কি না জানি আছে ওর ভেতর।

কিন্তু মনের এই দুর্ব্বলতা চেপে সকলের সঙ্গে ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করলুম।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পর আমরা একটু খোলা জায়গায় এসে পড়লুম। পাহাড়ের মাঝখানটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যেন এই গর্ত্তটা হয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে, এটাকে আগ্নেয়-গিরির গহ্বর বলে ভুল হয়।

সামনের দিকে চাইতেই একটা কালো গহ্বরের মুখ সকলের নজরে পড়ল। বড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে মুখটা বন্ধ।

মন আশা ও আনন্দে দুলে উঠল।

বললুম, এটা গহ্বরের মুখ রঞ্জিত, পাথর দিয়ে বন্ধ করা।

আনন্দে রঞ্জিতের চোখ জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল। বললে, আমি বাজি রাখতে পারি সুজিৎ, ওয়াবনিরা পাথর দিয়ে গর্তের মুখটা এঁটে দিয়েছিল। ভূমিকম্পে পাথরগুলো ঠেলে উঠে এসেছে।

বন্দুকটা হাতে করে রঞ্জিত গহ্বরের দিকে ছুটল। আমরা তার পিছু পিছু চললুম। আমরা পৌঁছাতে না পৌঁছোতে, সে আকাশ-ফাটানো চীৎকার করে বলে উঠল, ওয়াবনিদের হাতীর দাঁতের ভাণ্ডার। অতি আনন্দে কতক্ষণ কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। কিন্তু তার পরেই সকলে এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠলুম। সে চীৎকারের না আছে কোন মানে, না আছে কিছু। ছুটে গিয়ে সকলে পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালুম—স্বচক্ষে ভাণ্ডারটা দেখবার আশায়।

পাথরের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের রূপালি আলো এসে পড়েছে গহ্বরের মধ্যে। সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলো-ছায়ার মধ্যে গুহাটি যেন যক্ষের ধন-ভাণ্ডারের মত মনে হচ্ছিল। দেখি, গহ্বরের ভেতরে পাথরের দেওয়ালের গায়ে সারে সারে হাতীর দাঁত দাঁড় করানো রয়েছে। কতকগুলো কালক্রমে কালো, কতকগুলো হলদে হয়ে গেছে। কিন্তু তারি মধ্যে অনেকগুলো দুধের মত সাদা—চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল।

রঞ্জিত বললে, এর দাম অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ টাকা। প্রথমে আমরা বেছে বেছে ভালগুলো নিয়ে যাব। তারপর...

গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হোল। রঞ্জিত কথা অসমাপ্ত রেখে মাথা নীচু করতেই ওপর দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। সকলকে শুতে বলে রঞ্জিতও শুয়ে পড়ল।

বিস্মিতভাবে আমরা সকলে শুয়ে পড়লুম। এধারের উঁচু জায়গা থেকে ওয়াবনিদের পরিত্যক্ত গ্রামখানা বেশ দেখা যাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় দেখি, মেলাই নান্দি নিয়ে ভন টর্ট ও পিয়েট দাঁড়িয়ে আছে। দেখে, বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলুম।

ভাবতে লাগলুম, কেমন ক'রে এরা এত লোক সংগ্রহ করল! কি করেই বা লরী অনুসরণ করে এলো!

কিন্তু ভাববার সময়ই বা কই? বন্দুকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়াতে ভন টর্ট রাগে চীৎকার করে পাহাড়ের পাশে সরে গেল।

রঞ্জিত চীৎকার করে বললে, বড়ই দুঃখ হচ্ছে ভন টর্ট, তোমার একটু দেরী হয়ে গেছে।

ঠাট্টার সুরে ভন টর্ট উত্তর দিলে, কিছু দেরী হয়নি; ঠিক সময়েই এসেছি।

কমিশনার বললে, মিথ্যে বিবাদে লাভ নেই। ভন টর্ট বোধ হয় জানে না, আমি এখানে আছি। তারপর চেঁচিয়ে বললে, ভন টর্ট, তুমি এত নান্দি নিয়ে এখানে এসেছ কেন? তোমার মতলব কি?—আমি কমিশনার, জিজ্ঞেস করছি...

লুকানো জায়গা থেকে ভন টর্ট ব্যঙ্গভরে উত্তর করলে, সে আমি বেশ জানি।

কমিশনার বললে, তবে আমার আদেশ—এক্ষণি লোকজন নিয়ে তুমি ফিরে যাও।

ভন টর্ট সেই রকম স্বরে বললে, তামাসা বড় মন্দ নয়।

রাগে কমিশনার ফেটে পড়ে বলে উঠল, এই অসভ্য-গুলোকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। তুমি কি চাও?

ভন টর্টের উত্তর ভেসে এল: ওয়াবনিদের হাতীর দাঁতগুলো চাই। তুমি ওই দু'টো কুকুরের কাছে ঘুষ খেয়ে ওদের দলে যোগ দিয়েছ। তোমাদের কাউকেও আমি ছাড়ব না।

—কি! আমি ঘুষ খেয়েছি?—কমিশনার গর্জ্জে উঠল।

ভন টর্টের কথা ভেসে এল: সে তুমিই জান; কিন্তু তোমাদের সকলকে মেরে আমি হাতীর দাঁত অধিকার করব। তোমরা যে আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছ—এর জন্যে ধন্যবাদ।

—রাজার নামে···কমিশনারের বাকী কথা নান্দিদের প্রচণ্ড কলরবে ঢাকা পড়ে গেল।

তাদের চীৎকারে রাত্রির স্তব্ধতা গেল ভেঙে। ভন টর্ট আর পিয়েটের আদেশ শোনা যেতে লাগল। বুঝতে পারলুম, আক্রমণের আর দেরী নেই।

রঞ্জিত হাসতে হাসতে কমিশনারকে বললে, ভন টর্টের

আসল মূর্ত্তি এবার প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ওরা ডাকাত। এতক্ষণে আমার কথা বিশ্বাস হোল ত?

কমিশনার লজ্জিত হয়ে বললে, ভন টর্ট সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ, সব সত্যি। তোমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ আমি তুলে নিলুম। ওই…

পঙ্গপালের মত নান্দিরা এ পাশের ঢালু পথে উঠছে। রঞ্জিত বললে, ওরা এগুচ্ছে; ভাল কথায় আর কাজ হবে না। গুলি ছুড়তে আরম্ভ কর।

ছ'টা বন্দুক থেকে অবিশ্রাম গুলি ছুটতে লাগল। সবগুলো বৃথা হোল না। ভন টর্ট আর পিয়েটের বন্দুকও ওধার থেকে গর্জ্জে উঠল। কিন্তু নান্দিরা যেন ক্ষেপে গিয়েছে। মৃত সঙ্গীদের পায়ের তলায় মাড়িয়েই তারা ছুটে আসছে।

এ যেন মরণ-পণ যুদ্ধ—এর সঙ্গে সিংহদের সেই ভীষণ যুদ্ধেরও তুলনা হয় না।

হঠাৎ দেখি, একটা পুলিশ আর্ত্তনাদ করে, দাঁড়াতে গিয়েই পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে পড়ল।

ছ'জনের মধ্যে একজন চলে গেল…

উপসংহার

নান্দিরা ক্রমশঃই অগ্রসর হচ্ছে। একবার যদি তারা উঠতে পারে, তবে হাতীর দাঁতের আশা আমাদের চিরদিনের মতই ছাড়তে হবে। প্রাণপণে পাঁচজনে গুলি চালাতে লাগলুম। এ ছাড়া অন্য উপায়ই বা কি আছে?

কিন্তু নান্দিদের থামান অসম্ভব। তারা রক্ত-পাগল হয়ে ছুটে আসছে। মৃত সঙ্গীদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

মনটা কেমন দমে গেল। রঞ্জিতের দিকে চেয়ে দেখি, নির্ব্বিকার ভাবে সে গুলির পর গুলি ছুড়ে যাচ্ছে। সে যেন মানুষ নয়, চলন্ত কোন কল। তাকে দেখে নিজের দুর্ব্বলতার জন্যে লজ্জিত হলুম। ছিঃ! সামান্য একটি মুহূর্ত্তও এখন দামী। নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমার উচিত হয়নি।

কমিশনার বাকী দু'জন পুলিশকে নিয়ে একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের গুলি ছোড়া দেখে মনে হোল—পাহাড় থেকে যেন অবিরাম অগ্নি-বৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোল। সঙ্গীর পর সঙ্গীকে মরতে দেখে শেষে নান্দিরা ভয়ে পেয়ে গেল। ছত্রভঙ্গ হয়ে

তারা নীচের দিকে পালাতে লাগল। ভন টর্ট আর পিয়েটকেও তারা ঠেলে নিয়ে চলল সঙ্গে।

ভন টর্টের চীৎকার ভেসে এল ঃ তোরা একজনও ওখান থেকে জ্যান্ত বেরুতে পারবি না—তোদের সকলকে ইঁদুর-কলে ফেলে শুকিয়ে মারব।

ভন টর্টের কথা শুনে রঞ্জিত মৃদু স্বরে বললে, শয়তানটা ঠিকই বলেছে। আমাদের শুকিয়ে মারতে পারে ও। চল, এগোই। ওদের আবার একসঙ্গে জড়ো হবার সময় দোব না।

রঞ্জিতের কথা শুনে আমরা সকলে নেমে আক্রমণ করতে ছুটলুম। কারামোজা ও করঙ্গো চীৎকার করতে করতে সঙ্গে ছুটে আসতে লাগল।

গুলি ছোড়া আমরা একবারও বন্ধ করিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে ভন টর্ট ও পিয়েট নান্দিদের আবার একটা পাথরের আড়ালে জড়ো করেছে। সেখান থেকে দু'টো গুলি ছুটে এল।

আমাদের দলে আর চার জন মাত্র বন্দুক ছোড়বার লোক রইল।

রঞ্জিত চীৎকার করে উঠল, চল, ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু ওরা এমন জায়গায় আশ্রয় নিছে যে, সেখানে যাওয়া অসম্ভব।

রঞ্জিত বললে, ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে তাক করে বন্দুক ছোড়—আত্মরক্ষাও হবে, গুলিও নষ্ট হবে না।

আমাদের গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে নান্দিদের আর্ত্তনাদ ভেসে আসতে লাগল। ওপক্ষের আক্রমণও কমে এল।

হঠাৎ দেখি, কতকগুলো নান্দি যোদ্ধা বর্শা হাতে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।

বন্দুকে টোটা ভরবার অবকাশে পেছন ফিরতেই ভন টর্টের উল্লসিত স্বর কাণে এল: এইবার শুয়োরগুলোকে বাগে পেয়েছি। এগিয়ে চল পিয়েট···আক্রমণ কর না গুরু-সর্দ্দার!

এবার ওরা দু'ধার থেকে আক্রমণ করেছে। নান্দিদের দিকে বার কয়েক গুলি ছুড়ে আমরা পিয়েটের দিকে ফিরলুম।

অসীম সাহসের সঙ্গে ভন টর্ট তার লোকদের নিয়ে এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি যুদ্ধজয়ের জন্যে সে তার সর্ব্বস্ব পণ করেছে। সে বুঝতে পেরেছে, এমন সুযোগ আর সে পাবে না।

রঞ্জিত বলে উঠল, আক্রমণ কর, দেরী কোর না। ভন টর্টকে ফেলতে পারলে···

বন্দুকের আওয়াজ আর চীৎকারে রঞ্জিতের বাকী কথা শোনা গেল না।

আকাশে যে সরু ফালির মত চাঁদ ছিল—তা ডুবে গেল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল। কোন পক্ষই লক্ষ্য ঠিক করতে পারছে না। দেখতে দেখতে যুদ্ধ ক্রমে হাতাহাতিতে এসে দাঁড়াল।

রঞ্জিত ভন টর্টের কাছে যাবার জন্যে ছুটল—সামনে, পাশে, দু'ধারে নান্দিদের উপর বন্দুক আর ঘুসি চালাতে চালাতে।

কারুর ফাটলো মাথা—কেউ বা গড়িয়ে নীচে পড়ল। নান্দিরা সভয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিল।

বাঘের মত লাফ দিয়ে রঞ্জিত ভন টর্টের উপর পড়ল। শিশুর মতই তাকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিলে! সামনে দু'তিন জন নান্দি বর্শা উঁচিয়ে তুলতেই রঞ্জিত ভন টর্টকে সবেগে তাদের উপর ছুড়ে দিলে। টাল সামলাতে না পেরে তারা নীচে গড়িয়ে পড়ল।

রঞ্জিত ভন টর্টকে আবার ধরলে। তারপর পা দু'টো ধরে মাথার চারপাশে তাকে কুমোরের চাকের মত বন্ বন্ করে ঘোরাতে লাগল। যে কজন নান্দি তখনও বাকী ছিল, তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাওয়ানা নয়, ভূত-দানা···পালিয়ে আয় —বলে তারা ছুট দিল।

ভন টর্ট মাটিতে পড়বার দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

রাত্রি-শেষের ঊষার আলো তখন ফুটে উঠেছে। বললুম, রঞ্জিত, শীগগির লরীর কাছে চল—পিয়েট যদি······

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সকলে লরীর দিকে দৌড়াল।

বেশীদূর এগোতে হোল না—দেখি পিয়েট মাটিতে ম'রে পড়ে আছে—সমস্ত দেহে তার বর্শার খোঁচার দাগ। বুঝলুম, নান্দিরা হতভাগ্যের ওপর শোধ নিয়েছে।

কমিশনার গাঢ় স্বরে বললে, মরণের দ্বার থেকে আমরা

ফিরে এসেছি বললেই হয়। তুমি যে আমার প্রাণরক্ষা করেছ—তা ভুলব না। হাতীর দাঁত নিয়ে যেতে…

রঞ্জিত হাসতে হাসতে তাড়া দিয়ে বললে, কারামোজা, খাবার কই? সারারাত্রি যে খাটুনি গিয়েছে…

* *

সমস্ত হাতীর দাঁত আনতে, ফিরে এসে কারামোজা আর করঙ্গোর সঙ্গে আরও তিনখানা লরী পাঠাতে হয়েছিল।

কারামোজা আর করঙ্গো এখন বড়লোক—টাকার গদীর ওপর শুয়ে থাকতে পারে।

মাল বহার কাজ ছেড়ে দিয়েছি—টাকার আর অভাব নেই। কিন্তু আফ্রিকা ছেড়ে আসতে পারিনি—কারামোজা আর করঙ্গোর স্নেহের মায়া কাটিয়ে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দূর দিগন্তের দিকে যখন চেয়ে বসে থাকি—আফ্রিকার ছবি তখন মন থেকে মুছে যায়। কল্পনায় চোখের সামনে ফুটে ওঠে—বাংলার শ্যামল পল্লীর একখানি গৃহ। সন্ধ্যার মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়ে বধূ তুলসীতলায় গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে—সে যে বাবার মুখে গল্প শোনা আমার ছেলেবেলায় হারানো মা! দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে, দু'ফোঁটা জলও ঝরে পড়ে।

BAGHBAZAR ... Estd. 1883. ... Street, Calcutta